# সন্তরণ পরিচয়

শান্তি পাল

২০৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল
কাত্যায়নী বুক স্টল
২০৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

দাম বার আনা

প্রিণ্টার — শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেক্‌জান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# উৎসর্গ

দেবোপম চরিত্র

পরমারাধ্য

ইংলণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সন্তরণ-বিশারদ

স্বর্গীয় ডাঃ সুরেশচন্দ্র পাল

পিতৃদেবের শ্রীচরণারবিন্দে

এই পুস্তক

উৎসর্গ করিলাম।

স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেশচন্দ্র পাল

যিনি ভারতীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইংলিশ প্রণালীতে সাঁতার দিয়াছিলেন

# পূর্ব্বাভাষ

এ বইখানির লেখক লিখিত ভূমিকায় একটি কথা পড়লাম যে, বাংলা ভাষায় সন্তরণ শিক্ষা বিষয়ে একখানিও পুস্তক নেই, সেই অভাব দূর ক'রবার জন্য এই পুস্তকের প্রকাশ। এই কথাটি ভ্রমাত্মক নয় ব'লেই আমার বিশ্বাস, কারণ সন্তরণ সম্বন্ধে কোনো বই পড়েছি বা দেখেছি ব'লে উপস্থিত মনে পড়ছে না। সুতরাং, এই অতি-প্রয়োজনীয় অথচ অতি-উপেক্ষিত বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করার জন্যই সর্ব্বাগ্রে গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ; শুধু নদ-নদীই নয়;—খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতি বহুবিধ জলাশয়ে এ দেশের ভূমি আকীর্ণ। স্থানান্তরে গমনাগমনের জন্য বহু অঞ্চলে বড় বড় নদীর সাহায্য নিতে হয়,—কোনো কোনো অঞ্চলে তদ্ভিন্ন উপায়ান্তরই নেই। নিত্যকার স্নানের জন্য প্রত্যহ বহু লোককে জলাশয়ে অবতরণ করতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় হিসাবেও সন্তরণ একটি শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনে জলাশয়ের সহিত সংশ্লেষ অনিবার্য্য, অতএব সাঁতার শেখার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না।

গ্রন্থকার শ্রীমান্ শান্তি পাল ভারতবর্ষের মধ্যে একজন বিখ্যাত সাঁতারু এবং সন্তরণ-শিক্ষক। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ সহন-সন্তরণে সমস্ত জগতের পূর্ব্ব-অধিগতি অতিক্রম ক'রে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। সুতরাং এমন একজন উপযুক্ত

ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হয়ে এ বইখানি শুধু সন্তরণ-সাহিত্য বিষয়ে অভাব অপনোদনই করেনি। এ বিষয়ে বহুদিনের জন্য প্রামাণ্য হ'য়ে রইল।

বইখানিতে প্রধানতঃ দুটি বিভাগ আছে,—বঙ্গদেশে সন্তরণের সাধারণ ইতিহাস, এবং সন্তরণ-শিক্ষা বিষয়ক কলা-কৌশল। সুতরাং শিক্ষার্থী এবং ইতিবৃত্তের উপকরণ সংগ্রহকারী উভয়ের পক্ষেই বইখানি মূল্যবান হয়েছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বইখানি কম চিত্তাকর্ষক হয়নি।

আমি আশা করি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এ বইখানি প্রবেশ লাভ ক'রে সন্তরণ বিষয়ে অনন্যভূতপূর্ব্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করবে।

বিচিত্রা-নিকেতন
কলিকাতা
১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪১

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

# নিবেদন

সাঁতারের প্রচলন দেশ বিশেষে আবদ্ধ নহে। সাঁতারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও পৃথিবীর সকল দেশে মোটামুটি একই ধরণের। দেশ ভেদে বিশেষত্ব কিছু যে না থাকিতে পারে, এমন নহে; কিন্তু মূলতঃ সাধারণ রীতি এক এবং অভিন্ন। আমি এই পুস্তকে সাঁতারের বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি অপরাপর দেশের অনুসৃত ও লিপিবদ্ধ নিয়মের সহিত তাহার কোন কোন অংশে মিল থাকিতে পারে।

ইহা আমার প্রথম প্রচেষ্টা। সময়ের রেকর্ড সম্বন্ধে দুই-এক জায়গায় ভুল থাকিলেও থাকিতে পারে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সেই ত্রুটী আমাকে জানাইলে, আমি পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করিয়া লইব।

পুস্তকখানি প্রকাশের জন্য কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ এবং বসুমতী কার্য্যালয়ের খেলা-ধূলা বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারানাথ মুখোপাধ্যায় কয়েকখানি ব্লক ও সময়ের তালিকা দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ডাক্তার বামাপদ বসুর সৌজন্যে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক আমাদের সমিতির উদ্দেশ্যে লিখিত "জলচর ক্লাবের জল্‌সা রঙ্গ" শীর্ষক প্রসিদ্ধ গানটি পাইয়াছি। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বিচিত্রা" পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। আমি ইঁহাদের সকলেরই নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শান্তি পাল

## শান্তি পাল প্রণীত

১। ওয়াটার-পোলো

২। হাত-পাড়ি

৩। ছায়া ( কবিতা গ্রন্থ )

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

মিঃ এন্ এন্ ভোস্-বার-এট্-ল

সম্পাদক— বেঙ্গল অলিম্পিক ( সন্তরণ বিভাগ )
সহকারী সভাপতি— সেণ্টাল সুইমিং ক্লাব
ইনি আধুনিক সাঁতারের উন্নতির জন্য সবিশেষ
চেষ্টা করিতেছেন।

# জলচর ক্লাবের জল্‌সা রঙ্গ

রং-বেরঙের সঙের বাসা
আমাদের এই সহর খাসা
তাহার মাঝে আছে ক্লাব এক সকল ক্লাবের সেরা—
পুকুর জলে তৈরী সে যে ঝাঁঝির দামে ঘেরা—
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
কাৎলা, চিতল, কাঁকড়া, কাছিম, ব্যাঙের বিহার ভূমি।—

কোথায় এমন দলে দলে, হামাগুড়ি দেয় রে জলে
কোথায় মানুষ যায় ভিড়ে ভাই, জলচরের ঝাঁকে
তারা ভুঁড়ির বয়ায় ভর দিয়ে সব বেবাক ভেসে থাকে।
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—
শুশুক্, জলহস্তী, হোয়েল, হিপোর মল্লভূমি।

কাদের জল-ঝম্প হেরে মৎস্য ভাগে লম্ফ মেরে—
ব্যাঙের কড়র্ কড়র্ ধ্বনি কণ্ঠেতে মুলতুবী
যেন, মর্ত্ত্যে জগঝম্প বাজে আকাশে দুন্দুভি!
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
"বড়কু" "রবীন" "শান্তি" "যুগল" "ফ্যাটির" মিলন ভূমি।

হাঁস-সাঁতার আর নেটিভ ডাইভ্
কোথায় এমন করে থ্রাইভ্
সাঁতারবাজের মডেল কোথায় "নিবারণী" ষ্টাইল্
কোথা সাবমেরিনের বহর দেহে বোম্বেটে সব কাহিল।
এমন ক্লাবটি কোথাও·········
মাছরাঙা, পানকৌড়ি, সারস, বকের বিলাস ভূমি।

কোন্ ক্লাবে ভাই, ভাইস্ প্রেসি-
ডেণ্ট্ লিবারল্ রাজার বেশী—
কোথায় এমন সেক্রেটারী, খাতির সহর জুড়ে
কোথা কেমিষ্ট, কবি, কারবারি ধায় কর্ম্মী এবং কুঁড়ে।
এমন ক্লাবটি কোথাও.........
ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপকের হাঁফ ছাড়িবার ভূমি।

নিত্য কাদের চিত্ত মাতে—
"নিক্কা সিং"-এর সিঙ্গাড়াতে,
রাজভোগে ভিৎ পোক্ত এমন কাদের ক্লাবে দাদা
কোথা আবগারী পাই-পয়সা না পায় চায়েতে মন বাঁধা :
এমন ক্লাবটি কোথাও.........
"প্রফুল্ল" দুই "জিতেন" "চন্দ্র"র হুল্লোড়েরি ভূমি।

দুধে-দাঁত আর পক্ক-কেশী—
কোথায় সবাই এক বয়সী—
হে ক্লাব তোমার তক্তা-ঘাটায় বাঁধা মোদের টিকি
আমরা তোমার সেবায় তাইত ঢালি ডজন ডজন সিকি।
এমন ক্লাবটি কোথাও.........
গুগ্‌লি, শামুক, চিংড়ি এবং মোদের আরাম ভূমি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তখন ক্লাবের বার্ষিক চাঁদা ছিল ৩৲ টাকা ; মাসিক ।৹ চিঃ ধরা হইয়াছিল।

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের পুরাতন তাঁবু

# একটি কথা

আজকাল প্রগতির যুগ আসিয়াছে। প্রগতি-মূলক কার্য্য লইয়া পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশেই একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছে—বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য—কিন্তু বাঙালী কি করিতেছে? তাহাদের স্থান কোথায়? আজ বাঙালী কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে, কি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে, এমন কি ব্যায়াম-ক্ষেত্র হইতেও প্রতিপদে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হইতেছে না? আমরা সেই বহু পুরাতন জীর্ণ আভিজাত্য লইয়া মত্ত; সারাদিন গোলামখানার দপ্তরে দৈনন্দিন চল্‌তি কার্য্যগুলি সমাপন করিয়া সায়াহ্নে "আঃ বাঁচিলাম" বলিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব পিঁজরা-পোলের মধ্যে আবদ্ধ থাকি ও পান-তামাকের আদ্য-শ্রাদ্ধ করি, আর করি সংবাদ-পত্রের মারফতে ভারতোদ্ধারের নিত্য নব নব পথ আবিষ্কার। বলা বাহুল্য, সঙ্গে চলে তাস, দাবা, পাশা, নাটক মহল্লা ইত্যাদি। শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ, গো-বেচারী জাতি এই বাঙালী; উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই বলিলেই চলে। যা করে অদৃষ্ট। পশ্চাৎ দিকে লক্ষ্য করি না এবং সম্মুখেও না। কোন্ দিকে যে লক্ষ্য, সেটা বলাও কঠিন। বর্ত্তমানের সাফল্যকে সর্ব্বদাই বরণ করিতে উৎসুক। সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করা সহস্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়। সর্ব্বদাই পর-চর্চ্চা, পর-নিন্দা, পর-কুৎসা করিতে উন্মুখ। শরীর-চর্চ্চাকারীরা গুণ্ডা বলিয়া আখ্যাত, কিন্তু তাঁহারা "ভদ্রলোক", যেহেতু

তাঁহারা পথে-ঘাটে অপমানিত হইয়া বেমালুম হজম করিবার এবং বন্ধু-মহলে অলঙ্কার দিয়া বর্ণনা করিবার একমাত্র শক্তি তাঁহাদেরই আছে। মাতা ও ভগ্নিগণকে বিপদে পতিত হইতে দেখিলে আততায়ীকে আক্রমণ করা দূরের কথা বরং সে স্থান হইতে 'গা-ঢাকা' দেন—যেহেতু তাঁহারা "ভদ্রলোক"।

আর এক শ্রেণীর "ভদ্রলোক" দেখিয়াছি—যাঁহারা নৌকা-বিহার-কালে, পার্শ্বে একটি লোক ডুবিয়া যাইতেছে, হয়ত নৌকার দাঁড়খানি বাড়াইয়া দিলে সেই নিমজ্জমান ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হইতে পারিত, কিন্তু পাছে তাঁহাদের সাক্ষ্য দিয়া বিড়ম্বিত হইতে হয়, সেই ভয়ে ভীত হইয়া ঘটনাস্থল হইতে অবিলম্বে সরিয়া পড়েন। আমাদের প্রগতি শুধু বক্তৃতায় এবং ছাপার অক্ষরে। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি একমাত্র পরিদৃষ্ট হয় পিঁজরা-পোলে! এই ধ্বংসোন্মুখ বাঙালী জাতি এইভাবে আর কতদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে? তাহারা কি একবার নিজের স্বাস্থ্যের দিকে ফিরিয়া চাহিবে না? ইংরেজীতে একটা চলিত কথা আছে—সম্পদ গিয়াছে, অর্দ্ধেক গিয়াছে। স্বাস্থ্য গিয়াছে, গিয়াছে সব। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রগতির মূলে আমরা কি দেখিতে পাই? তাহাদের প্রগতির মূলে একটা বিরাট শক্তি-চর্চ্চা রহিয়াছে। উহা লঘু বাক্যাড়ম্বর নয়—প্রকৃত কার্য্য। তাহারা সেই শক্তি-চর্চ্চার বলে বলীয়ান হইয়া সঙ্ঘবদ্ধতা ও শৃঙ্খলা উভয়ের সহযোগে মুক্তিলাভ করে। যেন এক সুরে বাঁধা। উহাদের মৃত্যুর মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে। দৈহিক শক্তির সহিত যে মানসিক শক্তির একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, একথা সকল দেশের সকল মনীষীরাই বলিয়া থাকেন বা বলেন। এই শক্তির ব্যাপ্তিলাভ করিতে হইলে বা নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, সেই গতানুগতিক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর আমাদের আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না।

বাস্তবিকই যদি সাঁতারুদিগের প্রগতিজনক মনোভাব জাগিয়া থাকে, বাস্তবিকই যদি তাঁহারা রুগ্ন, পীড়িত, নির্য্যাতিত ভ্রাতা-ভগ্নিদিগের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবিলম্বেই নব নব পথ-প্রদর্শন করাইতে হইবে। আর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না।

সহরের সহিত গ্রামের যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠতর করিতে হইবে। আভিজাত্যকে চিরবিদায় দিয়া, গ্রামের বালক-বালিকাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া, এই শক্তি-চর্চ্চায় তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত ও প্রলুব্ধ করিতে হইবে। সর্ব্বস্তরের ছেলে-মেয়েদের অন্তরে নব প্রেরণার সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে। বাঙালী একমাত্র সন্তরণ ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। সন্তরণের বিশেষ চর্চ্চা বাংলাদেশে কেবলমাত্র কলিকাতায় পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই চর্চ্চা যে একমাত্র কলিকাতার সমিতির আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত। আমাদের জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে কি সহরে, কি গ্রামে, প্রত্যেক উচ্চ ও নিম্ন-বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে সন্তরণ ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে হইবে। কলিকাতার সন্তরণ সমিতির সহিত জেলার এবং জেলার সহিত গ্রামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। জেলায় জেলায় একটি করিয়া শাখা-সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। এখান হইতে শিক্ষিত সাঁতারু তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ইহার কলা-কৌশল, উপকারিতা ও আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিবেন। তরুণ সাঁতারুরাও সেইভাবে গ্রামে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের নূতন শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচার করিবে। কখনও গ্রামে গ্রামে, কখনও বা আট-দশটি গ্রাম একত্রিত হইয়া জেলার সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইবে। স্বাস্থ্যই মানুষের একমাত্র সম্পত্তি।

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, স্বাস্থ্য গঠন হইতে শৃঙ্খলা, শৃঙ্খলা হইতে সঙ্ঘবদ্ধতা এবং সঙ্ঘবদ্ধতা হইতে শক্তি-সঞ্চয়।

বাংলা ভাষায় সন্তরণ শিক্ষার একখানিও পুস্তক নাই—এই অভাব দূর করিবার জন্য কয়েকটি "মূল পাড়ি" ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। শিক্ষার ব্যাপ্তিলাভ হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শান্তি পাল
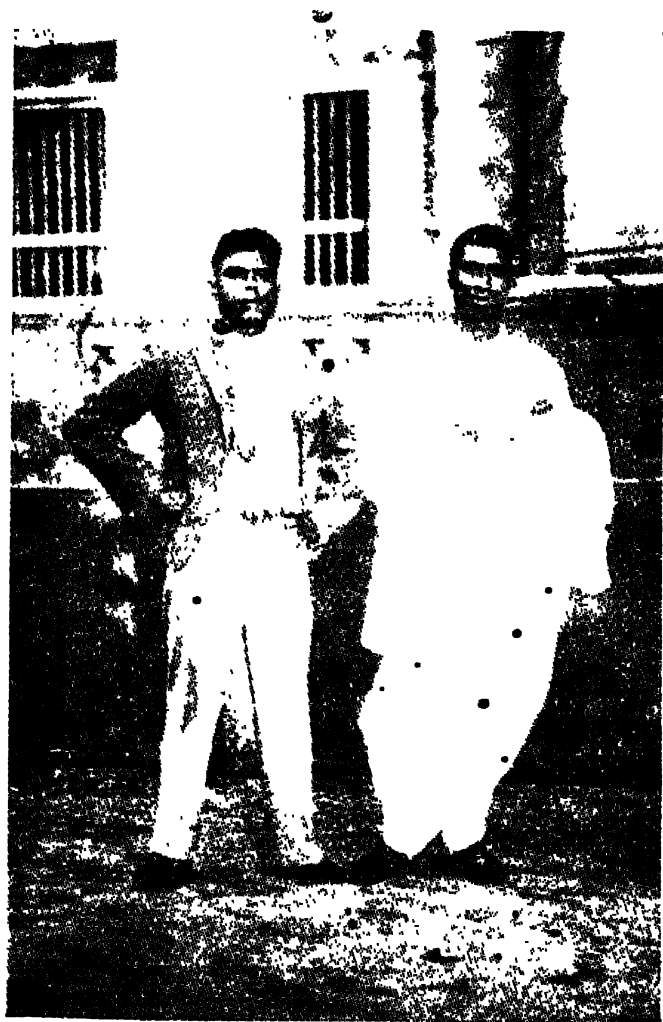
শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ ও শান্তি পাল

# পরিচয়

সাঁতার-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় সাঁতারের চর্চ্চা মোটেই ছিল না—একথা বলিলে ভুল বলা হয়। ঐ সঙ্ঘ গঠনের বহু পূর্ব্বে আমরা নিয়মিতরূপে গঙ্গায় সাঁতার দিতাম। আমাদের দল জোড়াসাঁকোর কতকগুলি তরুণ সাঁতারুদের সহিত মিলিত হইয়া দুই-তিন ঘণ্টা ধরিয়া সাঁতার চর্চ্চা করিত। মোট কথা, তখনকার দিনে নানা প্রকারের এত কৌশল ছিল না বটে, কিন্তু গঙ্গাতীরের অধিবাসী-দিগের মধ্যে অনেকেই অল্প-বিস্তর সাঁতার জানিতেন বা সাঁতারের চর্চ্চা করিতেন। জলের সহজ-প্রাপ্যতাবশতঃ পল্লীগ্রামের ছেলেরা সাঁতার কাটিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়া থাকেন, এমন কি পল্লীগ্রামের মহিলা-দিগের মধ্যেও অনেককেই বড় বড় দীঘিতে সাঁতার দিয়া পারাপার হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব সন্তরণ আমাদের বংশগত এবং জাতিগত বিদ্যা। বাংলাদেশে জলের অভাব নাই, চতুর্দ্দিকে খাল, বিল, নদী ও পুষ্করিণীতে পরিপূর্ণ।

আধুনিক সাঁতারের সহিত পূর্ব্বেকার সাঁতারের তুলনা করিলে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে দাঁড়-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার ও ডুব-সাঁতারের বেশী প্রচলন ছিল। দাঁড়-সাঁতারে দু'হাত তুলিয়া বা একহাতে ছাতা মাথায় দিয়া এবং অন্য হাতে দাঁত মাজিতে-মাজিতে গঙ্গার মাঝখানে বা অপর পারে যাওয়া তখনকার দিনে যথেষ্ট

সম্মান-জনক বলিয়া বিবেচিত হইত। আমার পিতাঠাকুর স্বর্গীয় সুরেশ-চন্দ্র পাল তখনকার দিনে একজন বিখ্যাত সাঁতারু ছিলেন। এক সময়ে তিনি ইয়োরোপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তিনি খরস্রোতা টেম্‌স্ নদী সোজাসুজি পার হইয়াছিলেন এবং ভারতীয়-দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেলে পঁচিশ মাইল সাঁতার দিতে সাহস করেন। তাঁহাকে দুইটি বড় বড় পিতলের ঘড়া জলে পূর্ণ করিয়া গঙ্গার মাঝখান হইতে আনিতে দেখিয়াছি। রায় বাহাদুর রসময় মিত্র, অভয়চরণ পাল—ইঁহারাও বড় সাঁতারু ছিলেন; বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ছুটিতে বা পূজা-পার্ব্বণে প্রায় গঙ্গায় তাঁহারা সাঁতার দিতেন। তখনকার দিনে ডুব-সাঁতারেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ডুবিয়া কে কতদূর যাইতে পারে তাহার প্রতিযোগিতা প্রায়ই আমাদের ভিতর হইত।

চিৎ ও দাঁড়-সাঁতারের প্রচলন আজকাল আর কলিকাতায় প্রায় নাই বলিলেই চলে। চিৎ-সাঁতার এখন একটা উচ্চ অঙ্গের সাঁতারের মধ্যে পরিগণিত নয়—অবশ্য বড় বড় সাঁতারুদের মনের এই ধারণা। তাঁহারা এই চিৎ-সাঁতারবাজদের অত্যন্ত হীন বলিয়া বিবেচনা করেন। আজ-কালকার দিনে যদিও প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেক প্রতিযোগিতার তালিকার মধ্যে একটী করিয়া একশত দশ গজ চিৎ-সাঁতারের পাল্লা থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে অনেকেই তাচ্ছিল্যের সহিত নাম দেন না। কিন্তু ঐ সাঁতারের যথেষ্ট উপকারিতা আছে। চিৎ-সাঁতারের কৌশলের দ্বারা জল-নিমজ্জিত ব্যক্তিকে যেমন করিয়া কিনারায় আনিবার সুবিধা হয়—তেমনটি অন্য কোন সাঁতারে হয় না। মনে পড়ে, ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে রথতলা ঘাটের সামনে সেণ্ট্রাল ক্লাবের সভ্য নিবারণ বাবু, ঐ চিৎ-সাঁতারের কৌশলে ভাগীরথীর মধ্যস্থলে একটি যুবতীকে সলিল-সমাধির করাল-গ্রাস হইতে অদ্ভুতভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

আজ-কালকার সাঁতারের পরিকল্পনা কিন্তু অন্য রকমের ; এখনকার দিনে যিনি যত দ্রুত সাঁতার কাটিয়া যাইতে পারেন, তিনি তত বড় সাঁতারু বলিয়া বিবেচিত ও সম্মানিত হন। এই শ্রেণীর সাঁতারুরা দ্রুত-গমন সাঁতার ভিন্ন অন্য ধরণের সাঁতার কৃতিত্বের সহিত কাটিতে পারেন না বা কাটিতে চেষ্টাও করেন না। তার প্রধান কারণ, তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করা। অনেক বড় বড় নামজাদা সাঁতারু দেখিয়াছি, যাঁহারা জল হইতে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে আদৌ সাহস করেন না। রক্ষা করা ত দূরের কথা, ঘটনাস্থল হইতে গা-ঢাকা দিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া দাঁড়ান।

তখনকার দিনে "পাড়ি" ছিল না, একথা বলা চলে না। সাধারণতঃ আমরা জলে কান পাতিয়া এক হাতে সাঁতার কাটিতাম, এই ধরণের সাঁতারকে আমরা "কান-পাড়ি" বা "এক-হাতি-পাড়ি" বলিতাম, অর্থাৎ এখন যেটা—"ওয়ান হ্যাণ্ড ষ্ট্রোক" বলিয়া পরিচিত। দ্রুত যাইবার জন্য আমরা কখন কখন দুটি হাতই ব্যবহার করিতাম। এই ধরণের সাঁতারকে "পাড়ি" বলিতাম, অর্থাৎ এখন যাকে ডবল ওভার আর্ম বলি। কখনও দুই হাত জলের মধ্যে রাখিয়া, পাশ ফিরিয়া, কাঁধে ধাক্কা দিয়া আর কখনও বা কান পাতিয়া এক হাতে টানিয়া, কখনও বা মুখ সামনে রাখিয়া দু'হাতে টানিয়া গঙ্গা পারাপার হইতাম।

এখনকার দিনে "পাড়ি"র এত উন্নতি হইয়াছে যে, আমরা ৩০।৪০ মাইল পথ মুহূর্ত্তের জন্য হাত বন্ধ না করিয়া দুই হাতে টানিয়া অর্থাৎ "পাড়ি" দিয়া সাঁতার দিতে কষ্ট বোধ করি না। আহিরীটোলা ও বাগ-বাজারের ছেলেরাই এ কার্য্যে পথপ্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য তার প্রধান কারণ, তাহাদের জলের নিকটেই বাস, যে স্থানে স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটা হয় সে স্থানেই অল্প-বিস্তর "পাড়ি"রও ব্যবহার

আছে। আহিরীটোলা ও বাগবাজারের ছেলেদের মধ্যে বাজি রাখিয়া কে কত অল্প সময়ের মধ্যে গঙ্গা পার হইতে পারে বা গঙ্গাবক্ষস্থ ভাসমান "বয়া"র তলদেশ হইতে মাটি তুলিতে পারে, এরূপ সাহসের কার্য্য প্রায়ই দেখিতাম। পল্লীগ্রামের ছেলেদের মধ্যে ডুব-সাঁতারে পুষ্করিণী পার হওয়া বা পুষ্করিণীর তলদেশ হইতে মাটি তোলা, জলক্রিয়ার একটি অঙ্গ-বিশেষ। মোট কথা সেকালের সাঁতারুদের ভিতর এমন একটা শক্তি বা ক্ষমতা ছিল, যাহার দ্বারা অনেক সময় অনেক স্থলে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে সলিল-সমাধির গ্রাস হইতে অনায়াসেই উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সে শক্তির অনেকটাই হারাইয়াছি এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতার পরিচয়ও দিয়াছি। সন্তরণ-সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা তালিকার মধ্যে চিৎ-সাঁতার জীবন-রক্ষা প্রণালী ও দাঁড়-সাঁতারের পাল্লা নিবদ্ধ করিয়া ঐ সকল বিষয়ে সাঁতারুদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে সচেষ্ট হন।

পূর্ব্বে মধ্য কলিকাতায় সাঁতার চর্চ্চা করিবার বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না। সাঁতার-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে "ওয়াই-এম্-সি-এর" গ্রে সাহেব ও প্রফুল্ল বিশ্বাস মহাশয় প্রভৃতির উদ্‌যোগে ঐ সমিতির কতকগুলি সভ্য মিলিয়া সার্কুলার রোডে মহারাজ কাশিম বাজারের বাটীর ভিতরস্থিত পুষ্করিণীতে প্রথম সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করেন। উঁহাদের মধ্যে একজনের জলে মৃত্যু হওয়ার ফলে কিছুকাল সাঁতার কাটা বন্ধ থাকে। ১৯১২ সালে ১৯শে নভেম্বর শিবপুর কলেজ ঘাটে একটী ভীষণ নৌকাডুবি হইয়া বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হন। ওয়াই-এম্-সি-এর সভ্যদের মধ্যে সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ সেন, রমণীমোহন গুপ্ত, প্রকাশচন্দ্র মিত্র, অমলকুমার গুপ্ত, পি, সীতারাম শাস্ত্রী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাধুখাঁ।

ইনি ১৯১৪ সালে বাঙালী সাঁতারুদিগের মধ্যে দূর-পাল্লায়
( ৪৪০ গজে ) সর্ব্বপ্রথম হাত-পাড়ির প্রদর্শন করেন এবং
১৯১৫ সালে নিখিল ভারতীয় সন্তরণ-প্রতিযোগিতায়
সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ সাঁতারু মিঃ ক্রেফোর্ডকে
৪৪০ গজে পরাস্ত করেন

প্রভৃতি অনেকেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যে কয়েকটি যুবক নিমজ্জিত ব্যক্তিদের উদ্ধার সাধন করিতে গিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। তাঁহাদের নামগুলি পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে গ্রে সাহেব ও রায় বাহাদুর হরিধন দত্ত প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া "ষ্টুডেণ্টস্ হলে" একটি সাধারণ সভা করেন এবং কলিকাতায় সাঁতারের আবশ্যকতা ও উপকারিতা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন এবং একটি "এ্যাসোসিয়েসন"ও গঠন করেন। ডাঃ স্যার্ নীলরতন সরকার, রাজা হৃষীকেশ লাহা, রায় বাহাদুর রাধাচরণ পাল, স্যার্ রাজেন্দ্র মুখার্জ্জী, পিকফোর্ড, উইল্সন্ ও ওট সাহেব প্রমুখ সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সাহায্যে ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে "কলিকাতা সুইমিং এ্যাসোসিয়েসন" নামে সর্ব্বসাধারণের ভিতর সাঁতার শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ম্যাডক্স সাহেবও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের কয়েকজন সভ্য মিলিয়া গোলদীঘিতে মধ্যে মধ্যে সাঁতার শিক্ষা করিতেন। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই ব্যাপারে উদ্‌যোগী ছিলেন।

এই এ্যাসোসিয়েসন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি "বাথ" নির্ম্মাণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই "বাথের" নক্সা মার্টিন কোং করেন এবং গঠন কার্য্যে ৮০,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। অবশেষে ১৯২৩ সালে উক্ত সঙ্ঘ গোলদীঘিতে প্রথম সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ঐ সালে ক্যাল্‌কাটা সুইমিং ক্লাব, হাওড়া ইউনিয়ান, ইংরেজ দল প্রভৃতি ক্লাবই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। বাঙালী সাঁতারুদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিবারণ দে, উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম

উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু সন্তরণ সমিতির আবির্ভাব হয়। মোহনবাগান, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, বিদ্যাসাগর কলেজ, ওয়াই-এম্-সি-এ প্রভৃতি সমিতি গঠিত হয়।

গঙ্গা-বক্ষে দীর্ঘ বা দূর-পাল্লার সাঁতারের প্রথম প্রচেষ্টা আহিরীটোলায় হয়। ১৯২২ সালে মে মাসে আহিরীটোলা সুইমিং ক্লাবের উদ্‌যোগে প্রথম সাত মাইল—উত্তরপাড়া হইতে মাণিক বোসের ঘাট পর্য্যন্ত—সাঁতারের প্রতিযোগিতা হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সালে আগষ্ট মাসে আহিরীটোলা ক্লাব (আহিরীটোলা সুইমিং নয়) ১৩ মাইল সাঁতারের আয়োজন করেন। এ প্রতিযোগিতায় আশুবাবু প্রথম স্থান অধিকার করেন। পুনরায় ইহাদের দেখাদেখি সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় জীবন-রক্ষা সমিতির সভ্যেরা ২২ মাইল সাঁতারের আয়োজন করিয়াছিলেন। চন্দননগর হইতে আহিরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত সীমা নির্দ্দেশ হয়। এই প্রতিযোগিতায় বাগবাজার ক্লাবের সভ্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ও সেন্ট্রাল ক্লাবের সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে প্রথম স্থান লইয়া একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। বিচারকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সতীশ বাবুর পক্ষ এবং কেহ কেহ বীরেন বাবুর পক্ষ অবলম্বন করেন। ফলে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর বীরেন বাবু জয়ী হন। এই সাঁতারের প্রতিযোগিতার দিনে দুটি ভীষণ দুর্ঘটনা হয়। প্রথমটি শ্যাম-নগরের নিকট মোটর বোট ডুবিয়া ডাঃ চাটার্জ্জীর মৃত্যু এবং অপরটি আহিরীটোলা ঘাটের জেটি ভাঙায় তাহার চাপে বহু লোকের প্রাণ-বিয়োগ। ১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসে আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যেরা ৩০ মাইল সাঁতারের আয়োজন করেন—হুগলী হইতে আহিরী-টোলা ঘাট পর্য্যন্ত। অকস্মাৎ জোয়ার আসায় এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ায় সাঁতারুদের পথিমধ্যে তুলিয়া লওয়া হয়। ১৯২৫ সালে নূতন উদ্যমে সেই

৩০ মাইল প্রতিযোগিতা পুনরনুষ্ঠিত হইলে হাটখোলা ক্লাবের গোপীনাথ বাবু প্রথম স্থান অধিকার করেন। উক্ত সালেই শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় আর একটি ২৩ মাইল সাঁতারের আয়োজন ( ভাটপাড়া হইতে কুমারটুলি পর্য্যন্ত ) হয়। এই প্রতিযোগিতায়ও প্রথম স্থানের জন্য শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষের সহিত ( যিনি দীর্ঘকাল সাঁতারের জন্য পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন ) হাটখোলা ক্লাবের শ্রীযুক্ত জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়ের "ডেট্ হিট" লইয়া মতদ্বৈত হয় এবং বিচারে জ্ঞান বাবুই জয়ী হন।

আজ ১৯৩৪ সালে, আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সন্তরণকারীদের তুলনায়, অল্প দৌড়ের পাল্লায় অনেক পিছনে পড়িয়া আছি। এ বৎসরের রেকর্ড দেখিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে হইলে আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রণালীর দ্বারা শিক্ষা করা উচিত। এ দেশের অধিকাংশ সন্তরণকারিগণ গায়ের জোরে সাঁতার কাটিয়া থাকেন—কোন নিয়মের ধার ধারেন না বা কোন উপযুক্ত লোকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন না। অনেকের ধারণা সাঁতার আবার কাটিব কি! এর আবার নিয়ম-কানুন কি আছে! কিন্তু যাঁহারা বিনা শিক্ষা-দীক্ষায় বড় সাঁতারু হইয়াছেন, দুঃখের বিষয় তাঁহারা নিজেরাও জানেন না, কি কৌশলে তাঁহারা সাঁতার কাটিতেছেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা সদুত্তর দিতে পারেন না। আরো দুঃখের বিষয় যে, আমাদের সমিতির কর্তৃপক্ষগণ এতদ্বিষয়ে এত অনভিজ্ঞ যে, তাঁহারা উৎসাহিত করা দূরে থাকুক, বরং অধিকাংশ সময়ই নবীন সাঁতারুদের নিরুৎসাহই করিয়া থাকেন।

কলিকাতায় মহিলাদিগের সাঁতার দিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। কর্পোরেশনের অধিকারভুক্ত অধিকাংশ পুষ্করিণী আমরা—পুরুষেরা—

দখল করিয়া বসিয়াছি। জনসাধারণের কর্ত্তব্য দুইটি "বাথ"—একটি উত্তর কলিকাতায় এবং অপরটি দক্ষিণ কলিকাতায়—কেবলমাত্র মহিলাদিগের জন্যই নির্ম্মাণ করা। দেশের সম্ভ্রান্ত এবং ধনবান ব্যক্তিরা যদি সামান্য একটু চেষ্টা করেন তাহা হইলে উপরোক্ত "বাথ" নির্ম্মাণ করা যে অনায়াসে সম্ভবপর হয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই বৎসর কলিকাতায় হেদুয়া পুষ্করিণীতে—"উয়োম্যান্ অ্যাথেলেটিক ক্লাব" মহিলাদিগের সাঁতারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই একটি মাত্র মহিলা-সন্তরণ সমিতিতে কি হইবে ?

# ক্রমোন্নতি

বর্ত্তমানে সন্তরণ ক্রমশঃই যেরূপ জনপ্রিয় ব্যায়ামের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয় আমাদের দেশের ছেলেরা অতি অল্পদিনের মধ্যেই আন্তর্জ্জাতিক সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। নানা অসুবিধার মধ্য দিয়াও আমাদের দেশের ছেলেরা যেরূপ দিনের পর দিন সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সময়ের সংক্ষেপ করিতেছে, বাস্তবিকই তাহা অত্যন্ত গৌরব-জনক। শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষ দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণে এক অভূতপূর্ব্ব ও অভাবিত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা আন্তর্জ্জাতিক "অলিম্পিক"-ভুক্ত নহে। এই ধরণের সন্তরণ অলিম্পিক গ্রাহ্য করে না। অলিম্পিক-ভুক্ত প্রতিযোগিতায়, অর্থাৎ ১১০, ৪৪০, ৮৮০ ও ১৭৬০ গজ সন্তরণের জন্য অবিলম্বেই আমাদিগকে প্রস্তুত হইয়া বাঙালী সাঁতারুর সম্মান বজায় রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৯১৩ সালের পূর্ব্বে বাংলাদেশে কোনরূপ চিরস্থায়ী সন্তরণ প্রতিযোগিতা বা সন্তরণের নিয়মিত ব্যায়াম হিসাবে—চর্চ্চা ছিল না। আমরা দেখিতে পাইতাম কেবলমাত্র কলিকাতায় আহিরীটোলা, বাগবাজার, জোড়াসাঁকো—মোটকথা ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তীর স্থান সমূহের অধিবাসীদিগের মধ্যে এই সন্তরণ-চর্চ্চা কতকটা নিবদ্ধ ছিল। আমাদের নিজেদের মধ্যে কখনও কেহ কেহ দুই-এক পয়সা

বাজী রাখিয়া অনেক সময়ে গঙ্গা পারাপার হইতাম। তখনকার দিনে পাড়ির এত নাম ছিল না।

মধ্যে মধ্যে দ্রুত কিংবা স্রোতের বিরুদ্ধে যাইবার জন্য দুই হস্ত দুই পদ পরিচালন করিতাম, যাহা এখন "ক্রল, বা ট্রাজান" বলি।

এ কথা কিছুতেই স্বীকার করি না যে উক্ত ধরণের "ক্রল বা ট্রাজান" পাড়ি আমাদের দেশে ছিল না। পূর্ব্ব-বঙ্গে অনেক পল্লীতে আমরা দেখিতে পাই যে ছেলেদের মধ্যে "ওয়ান হ্যাণ্ড, ডবল ওভার-আর্ম, ক্রল বা ট্রাজান ষ্ট্রোক" প্রচলিত—যদিও এই সকল স্থানে এখনও পর্য্যন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলযুক্ত সাঁতারের রীতি ব্যাপক ভাবে প্রচার হয় নাই। ছেলেরা অবলীলাক্রমে "ক্রল" বা ডুন, ট্রাজান বা কাঁচি পাড়িতে সাঁতার দিতেছে। কে তাহাদের শিক্ষা দিয়াছে? স্মরণ রাখা উচিত যে নদী-মাতৃক বাংলাদেশে সন্তরণ বিদ্যায় বাঙালীর জন্মগত অধিকার।

পশ্চাত্যের অনুকরণে সন্তরণ অনুশীলনের জন্য ইং ১৯১৩ সালে কলেজ স্কোয়ারে সুইমিং এ্যাসোসিয়েসনের উদ্বোধন হয়। এই বৎসর বাঙালীদিগের মধ্যে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১১০ গজে ( ছাত্রদিগের মধ্যে ) ও ২২০ গজে ( ভারতীয়দিগের মধ্যে ) প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সন্তরণ প্রতিযোগিতায় উপেন বাবু ও অন্যান্য বাঙালী সাঁতারুবৃন্দ ৫৫ গজের উপর পথ অতিক্রম করিতে হইলেই এক-হাতি পাড়ি ব্যবহার করিতেন।

মিঃ ভ্যান্-ডাইক ১১০ গজ ( এমেচার ) ও ৪৪০ গজে "ক্রল্" বা ডুন্ পাড়ির সাহায্যে অর্থাৎ দুই হাত ও দুই পা ডুন্ পরিচালন দ্বারা সমগ্র দর্শকবৃন্দকে বিস্মিত করিয়া ১ মিনিট ২২ সেকেণ্ড ও ৭ মিনিট ৭ সেকেণ্ডে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই ( দর্শকবৃন্দ )

সাতা৷ পর শ্রী৷ মোহন দে গবর্ণরের সহিত র্দ্দিন রিতো

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলাম—"ভদ্র লোকের কি দম্! একবার মাথা ডুবাইয়া, এক দমে ওপারে মাথা তুলিলেন।"

তখনকার দিনে এইরূপে চারদফে পুষ্করিণী পারাপার বাস্তবিকই অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার! মিঃ ভ্যান্‌ডাইক যে জলের উপর দেহের সহিত ঋজুভাবে মস্তক রাখিয়া প্রত্যেক হস্ত চালনার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাস লইতেছিলেন তাহা তখনকার দিনে আমরা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমাদের সাঁতারের ধরণ বা কায়দা ভিন্ন প্রকার ছিল। আমরা বরাবরই জলের উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া মুখের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া সাঁতার কাটিতাম। কখনও কখনও জলের মধ্যে মুখ ডুবাইয়া, দম বন্ধ রাখিয়া এবং দ্রুত পদবিক্ষেপে কুড়ি-পঁচিশ হস্ত পথ যাইতাম! ইহা এখন "আমেরিকান-ক্রল" পর্য্যায়-ভুক্ত। বলা বাহুল্য, আমরাও ওই দিবস হইতে আমাদের সন্তরণের রীতি বা কৌশল পরিবর্ত্তন করিলাম। এই কার্য্যের শ্রীযুক্ত নিবারণ দে (ফ্রেণ্ডস্ পোলো), ও জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (আহিরীটোলা) প্রভৃতি অগ্রণী ছিলেন।

১৯১৪ সালে বাঙালী সাঁতারুদিগের মধ্যে দূর-পাল্লা প্রতিযোগিতায় অর্থাৎ ৪৪০ গজ পথ সাঁতারে শ্রীযুক্ত সুরেন সাধুখাঁ (বাগবাজার) সর্ব্ব-প্রথম দো-হাতি পাড়ি ব্যবহার করেন। এই ৪৪০ গজ পথ সাঁতার কাটিতে প্রায় ৭ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছিল। আমরা সকলেই সুরেন বাবুর পাড়ির চটক ও দম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন সাধুখাঁ ও নিবারণচন্দ্র দে বাঙালী সাঁতারুদিগের পথ-প্রদর্শক ও গুরুস্থানীয়।

১৯১৫ সালে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দে সুরেন বাবুর সন্তরণ কৌশল অনুকরণে ২২০ গজ প্রতিযোগিতায় প্রায় তিন মিনিট ৭ সেকেণ্ডে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। সুরেন বাবু ও নিবারণ বাবু পাড়ি হস্ত

ও পদের মিলের দিক দিয়া প্রায় একই ধরণের ছিল। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি জলের উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া গমনকালে দুই দিকে দুই হস্তের সহিত মস্তক পরিচালনা করিতেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি জলের উপর এক দিকে দেহের সহিত মস্তকের সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া সাঁতার কাটিতেন। উভয়ের গতি-ভঙ্গী "ক্রল ও ট্রাজান" মিশ্রিত ছিল।

ওই সালে নিকট পাল্লায় অর্থাৎ ১১০ দশ গজ প্রতিযোগিতায় মিঃ জেফর্ড নিছক দো-হাতি কাঁচি-পাড়ি ব্যবহার করিয়া প্রায় ১ মিনিট ২২ সেকেণ্ডে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। উহার সমসাময়িক সাঁতারুবৃন্দ মিঃ হাম্-ফ্রেজ, কক্, লে, মিলার প্রভৃতি সকলেই "ক্রল ও ট্রাজান" মিশ্রিত পাড়িতে সাঁতার কাটিতেন। মিঃ জেফর্ড চিৎ-সাঁতারও কৃতিত্বের সহিত কাটিয়া প্রথম স্থান এতাবৎকাল অধিকার করিতেন। শ্রীযুক্ত মোহনলাল ভট্টাচার্য্য (আহিরীটোলা) বাঙালীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতায় ইংরেজ সাঁতারুকে পরাজিত করেন। শ্রীযুক্ত রবীন রক্ষিত (সেণ্ট্রাল) ডাইভিং বা উঁচু ঝাঁপে সর্ব্বপ্রথম বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করেন। বুক-ঝাঁপের কথা স্বতন্ত্র, উহা বাঙালীদিগের প্রায় একচেটিয়া ছিল।

উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম বৎসর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু (মোহনবাগান) প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বুক-ঝাঁপে স্বর্গীয় হিমাংশু গুপ্তের (সেণ্ট্রাল) দান যথেষ্ট।

ওই বৎসর অর্দ্ধ মাইল প্রতিযোগিতা সুরু হইল—শ্রীযুক্ত মুরলীধর মুখোপাধ্যায় (আহিরীটোলা) মিঃ জেফর্ডের অনুকরণে নিছক কাঁচি পাড়ি দ্বারা সুরেন বাবুকে পরাজিত করিয়া ১৪ মিঃ ৩০ সেঃ সময়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিলেন। শ্রীযুক্ত

শ্রীদোয়ারকা দাস মুল্‌জী

শচীন মুখোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ সাঁতারুবৃন্দ ( আহিরীটোলা ) নিকট-পাল্লার সন্তরণে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সন্তরণ-ইতিহাসের একটি উল্লেখজনক ঘটনা এই যে, ঐ বৎসর মিঃ জেফর্ড ও প্রাইভেট্ ফেরিস নামক দুইজন ইংরেজ সমগ্র ভারতবাসীকে উদ্দেশ করিয়া ৪৪০ গজ ও ২২০ গজ প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন সাধুখাঁ ও নিরারণচন্দ্র দে এই আহ্বান ভারতবাসীর পক্ষ হইতে গ্রহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ৪৪০ গজ প্রতিযোগিতায় জেফর্ড সাহেবকে নির্ম্মম ভাবে পরাজিত করিয়া বাঙালী-সাঁতারুর মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান কলিকাতার গলষ্টন্ পার্কে হইয়াছিল। সন্তরণ-ক্ষেত্রে ইংরেজের এই প্রথম পরাজয়।

১৯১৭ সালে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ভড় ( আহিরীটোলা ) বাঙালী সন্তরণবিদ্‌দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নিছক "আমেরিকান-ক্রল্"-এ ১১০ গজ প্রতিযোগিতায় ১ মিঃ ১৭ সেঃ-এ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এতাবৎকাল উক্ত প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র ইংরেজরাই জয়লাভ করিতেন। এই দিবস হইতে দূর-পাল্লায় পূর্ণ-কাঁচি বা অর্দ্ধ-কাঁচি-পাড়ি এবং নিকট-পাল্লায় "ক্রল" অর্থাৎ ক্রন্ পাড়ি প্রচলিত হইল।

১৯১৮ সালে শ্রীযুক্ত যুগলকুমার গোস্বামী ( সেণ্ট্রাল ) ২২০ গজ প্রাতযোগিতায় পূর্ব্ববর্ত্তীদের অপেক্ষা কম সময়ে হওয়ায় সর্ব্বপ্রথম আমার সময়ের উপর লক্ষ্য পড়িল।

১৯১৯—২১ সাল পর্য্যন্ত সাঁতারের বিশেষ উল্লেখজনক উন্নতি হয় নাই। ১৯২১ সালে এক মাইল প্রতিযোগিতা সুরু হইল। শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন দে ( কলেজ স্কোয়ার ) "ক্রল্ ও ট্রাজান" মিশ্রিত এক প্রকার অদ্ভুত পাড়িতে অনুমান ২৮ মিঃ ৩৬ সেঃ-এ প্রথম স্থান অধিকার

করিলেন। বলা বাহুল্য এই দিবস পর্য্যন্তও পাড়ির ব্যাপক ভাবে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। শ্রীযুক্ত প্রবোধ ভড়, যুগল গোস্বামী ও মুরলী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন সাঁতারু ব্যতীত তখনকার দিনে আমরা সকলেই গায়ের জোরে পাঁচমিশালী পাড়ির সাহায্যে সাঁতার কাটিতাম। ছোট দলের মধ্যে দোয়ারকা দাস মুল্‌জী ( কলেজ স্কোয়ার ) দুই-একজন এক জাতীয় বিশুদ্ধ পাড়িতে সাঁতার কাটিতেন। অনেক অল্পভিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা যে দোয়ারকাবাবু গায়ের জোরে সাঁতার কাটিতেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল। গায়ের জোরে ১১০ গজ হইতে এক মাইল পর্য্যন্ত এরূপ স্বচ্ছন্দ গতি থাকে না।

বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও উপর্য্যুপরি পরাজয়ের ফলে ১৯২৩ সালের প্রারম্ভে আমি এক নূতন ধরণের চার-পদী ডুন্ পাড়ি আবিষ্কার করিয়া পরীক্ষাচ্ছলে পুরাতন পাড়ি পরিবর্ত্তনান্তে সর্ব্বপ্রথম শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষকে শিক্ষা দিলাম। সে ওই বৎসর—এই নবাবিষ্কৃত পাড়ির সাধনায় প্রতি প্রতিযোগিতায়—৫৫ গজ হইতে প্রায় ২৩ মাইল পর্য্যন্ত—পুরাতন সময় নির্দ্দেশ কৃতিত্বের সহিত সংক্ষেপ করিলেন। বাংলাদেশে সন্তরণ-ক্ষেত্রে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। এই দিবস হইতে সকল সাঁতারুর সময়ের উপর দৃষ্টি পড়িল। বর্ত্তমানে নবীন সাঁতারুদের মধ্যে অনেকেই ১১০ গজ হইতে ৩০ মাইল পথ পর্য্যন্ত এই ধরণের চার-পদী ডুন্ পাড়ির সাহায্যে পরিশ্রান্ত না হইয়া কৃতিত্বের সহিত সাঁতার কাটিতেছেন।

আমরা দেখিতে পাই দো-হাতি-পাড়ির সাহায্যে একমাত্র দোয়ারকা বাবু চার-পাঁচ বৎসর কঠোর সাধনার পর ২২০ গজ মাত্র প্রতিযোগিতায় দুই-এক সেকেণ্ড সময় সংক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৯২৯ সালে শ্রীযুক্ত নলীনচন্দ্র মালিক ( শ্মশানেশ্বর ) উক্ত চার-পদী ডুন্ পাড়ির ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিলেন।

তিনি ১৭৬০ গজে প্রফুল্লকুমারের সময় নির্দ্দেশ প্রায় পঁয়তাল্লিশ সেঃ সংক্ষেপ করিলেন। এই বৎসর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস (নাথের বাগান বর্ত্তমান কলেজ স্কোয়ার) ২২০ গজ হইতে ১৭৬০ গজ পথ পর্য্যন্ত—সমস্ত পূর্ব্বের সময় নির্দ্দেশ কৃতিত্বের সহিত সংক্ষেপ করিলেন। শ্রীযুক্ত রাজারাম সাহু (খেলাঘর বর্ত্তমান সেণ্ট্রাল) ১০০ মিটার অর্থাৎ ১০৯ গজ ৩ ইঞ্চি সাঁতারে প্রফুল্লকুমারের ১৯২৪ সালের সময়-নির্দ্দেশ কঠোর পরিশ্রমের পর প্রায় এক সেকেণ্ড-এ সংক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বলা বাহুল্য রাজারাম বাবু চির-উপেক্ষিত চিৎ-সাঁতারে এক যুগান্তর আনিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত এক-হাতি চিৎ-সাঁতার আজকাল সকলেই অভ্যাস করিতেছেন—অবশ্য এই ধরণের বা কায়দার চিৎ-সাতার অনেকেই পূর্ব্বে কাটিয়াছেন, কিন্তু এতাবৎকাল কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। আজকাল ডুন্-পাড়ির যুগ আসিয়াছে অতএব এই পুস্তকে উক্ত পাড়ি সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে আলোচনা করিব।

## নামকরণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশে "পাড়ির" বিশেষ কোন নাম ছিল না। আমরা মোটামুটি বহুদিনের প্রচলিত কথিত মামুলি নামগুলি চার-পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ব্যবহার করিতাম—যথা উপুড়-সাঁতার চিৎ-সাঁতার, দাঁড়-সাঁতার ও ডুব-সাঁতার ইত্যাদি এবং "পাড়িকে"ও ঐরূপ তিন-চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিতাম—যথা পাড়ি, এক-হাতি ও দো-হাতি ইত্যাদি। সাধারণের সুবিধার জন্য বিদেশী নামগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া দেশী নামকরণ করিলাম। ওয়ান-হাণ্ড-ষ্ট্রোক্—এক-হাতি পাড়ি, ওভার আর্ম—দো-হাতি পাড়ি, ট্রাজান—কাঁচি-পাড়ি, ক্রল্—ডুনু-পাড়ি, আমেরিকান ক্রল্, আমেরিকান ডুন্, অষ্ট্রেলিয়ান ক্রল্, অষ্ট্রেলিয়ান ডুন্,

ট্রাজান ক্রল্—চার-পদী-তুন্, সিক্সবীট্—ছয়-পদী-তুন্, সুইমিং-অন্-ব্যাক্—দো-হাতি-চিৎ, ব্যাক ক্রল্—এক-হাতি-চিৎ, হাই-ডাইভিং—উঁচু ঝাঁপ, প্লাঞ্জিং—বুক ঝাঁপ, ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক্—বুক-সাঁতার, টার্ণিং—ঘুরণ, প্ল্যাটফর্ম্ম—সাঁতার-মঞ্চ, ষ্টার্ট—ঝম্পোদ্যোগ। আশা করি বাঙলা নামগুলি সময়ে প্রচলিত হইবে।

## উপকারিতা

প্রত্যেক নর-নারীর সন্তরণ শিক্ষা করা আবশ্যক। সন্তরণে সমস্ত শরীর, মস্তিষ্ক ও শ্বাস-যন্ত্র পরিপুষ্ট, সুস্থ ও সবল হয়। পেশীসমূহ সুডৌল ও কোমল করে। রক্ত চলাচলের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সাধারণতঃ সাঁতারুরা সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। দীর্ঘায়ু ও বিমল আনন্দ লাভ করে। সাঁতার স্ত্রীলোকের একমাত্র ব্যায়াম। ইহা স্ত্রী-দেহের কমনীয়তা, মাধুর্য্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ছাড়া সাঁতারের আর একটি দিক আছে। বিপদকালে জলে আত্মরক্ষা করা বা নিমজ্জিত ব্যক্তিকে জল হইতে উদ্ধার করা একমাত্র শিক্ষিত সাঁতারুর পক্ষেই সম্ভবপর হয়। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর যদি কেহ দশ-পনেরো মিনিটের জন্য অবগাহন স্নান ও সামান্য সাঁতার কাটেন, এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাঁতারুও নবজীবন লাভ করেন।

অবগাহন স্নানে এবং হস্ত-পদ পরিচালনজনিত পরিশ্রমের ফলে শরীর হইতে এক প্রকার স্বেদ নির্গত হইয়া লোমকূপগুলি ধৌত, পরিষ্কৃত করে। ইহাও স্বাস্থ্যোন্নতির একটি কারণ। সন্তরণে মস্তকের কেশ হইতে পদদ্বয়ের নখ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। সন্তরণে ব্যায়ামবিদ্‌দিগের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ পেশীর বিকাশ হয় না বটে, কিন্তু যতটুকু বিকাশ হয় তাহা
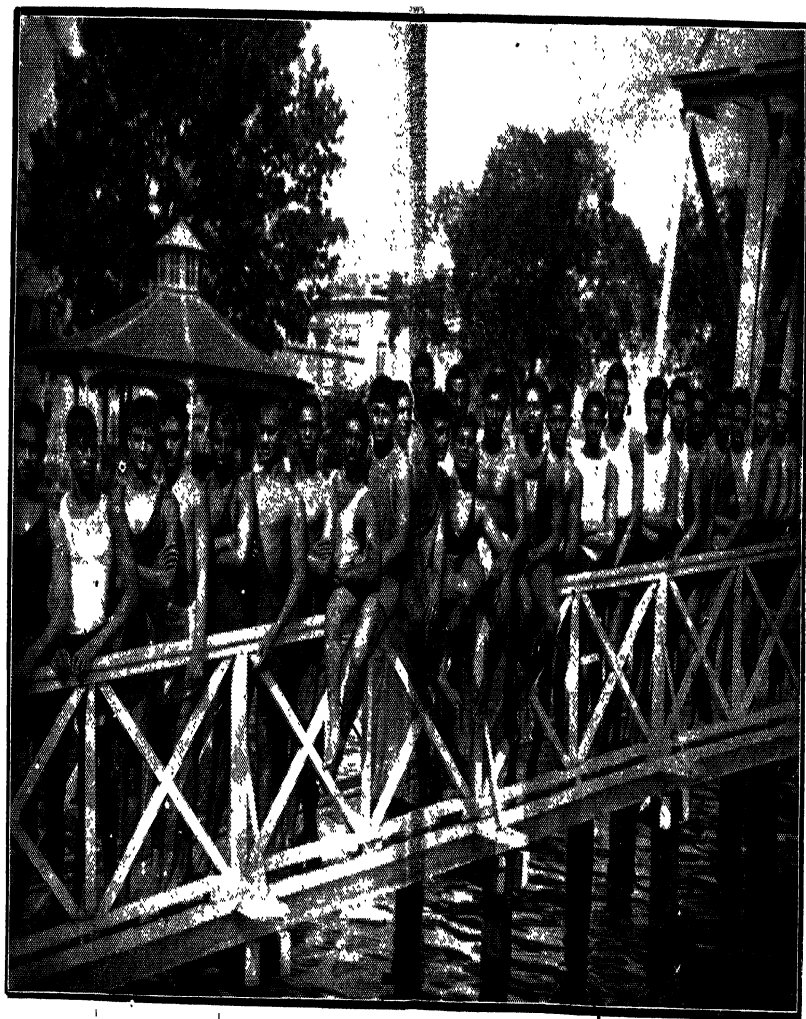
কলিকাতা "স্কুল অফ্ ফিজিকাল কালচারের" উদ্যোগে বাঙলার বিভিন্ন জেলার উপদেষ্টাদের ছুটির সময় সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে আধুনিক সন্তরণ শিক্ষা দিবার সর্ব্বপ্রথম আয়োজন।

কোমল ও যথেষ্ট কার্য্যক্ষম হয়। সাঁতারুরা ব্যায়ামবিদ্ অপেক্ষা কার্য্য-পটু, পরিশ্রমী ও সহনশীল হয় তাহা অনেক স্থলে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। বড় বড় মুষ্টি-যোদ্ধা, দৌড়বাজ প্রভৃতি নিয়মিত সাতার কাটিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করেন। আমাদের দেশ সুজলা এবং গ্রীষ্মপ্রধান, অতএব নির্ম্মল স্বাস্থ্যপূর্ণ আনন্দদায়ক উপেক্ষিত জল-ক্রীড়া বিনা ব্যয়ে সকলেই অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারেন।

## তুলনা

বিদেশী সাঁতারুদিগের সহিত তুলনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, এ দেশের সাঁতারুরা এই অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদের স্বকৃত চেষ্টায় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাদিগের কৌতূহল নিবারণের জন্য আমি তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ১৮৭৭ সালে এক মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিলাতের সাঁতারুরা ২৯ মিঃ ২৫॥০ সেকেণ্ড কাটিয়াছিলেন। পরে ১৮৯২ সালে ২৮ মিঃ ১৮—২এর৫ সেঃ, ১৮৯৩ সালে ২৬ মিঃ ৮ সেঃ, ১৮৯৭ সালে ২৬ মিঃ ৪৬॥০ সেঃ, ১৯০৭ সালে ২৪ মিঃ ৪২—৩এর৫ সেঃ এবং ১৯২৯ সালে ২১ মিঃ ৬—৪এর১০ সেকেণ্ড কাটিয়াছেন। আমাদের দেশে এই এক মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা ১৯২২ সালে সুরু হইয়াছে। প্রথম বৎসর এক মাইল পথ অতিক্রম করিতে অনুমান ২৮ মিঃ সময় লাগিয়াছিল। ১৯২৩ সালে ২৫ মিঃ ৪৯ সেঃ, ১৯৩১ সালে ২৫ মিঃ ৩ সেঃ এবং ১৯৩৪ সালে ২৪ মিঃ ৭ সেঃ সময় লাগিয়াছে। এই তুলনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এ দেশের সাঁতারুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। উপস্থিত মাইল-সাঁতার মিটারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শুদ্ধ সন্তরণে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে ও জাতীয় সম্মান লাভ করিতে হইলে সমিতি

এবং জাতির কর্ত্তব্য এই সকল নবীন সাঁতারুর প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করা, শুধু সংবাদ-পত্রের মারফতে "অপদার্থ" বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে না।

## প্রাথমিক শিক্ষা

সন্তরণ-শিক্ষার প্রথম দিবস হইতেই পাড়ির সাহায্যে অর্থাৎ দুই হস্ত জলেব উপর টানিয়া সাঁতার কাটিতে শিক্ষাদানের চেষ্টা করা উচিত। যদিও প্রথম প্রথম শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিণীর পাড়ির মধ্যে কোনও চটক থাকিবে না কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। এইরূপে প্রথম দিবস হইতেই পাড়িটি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সহিত অভ্যাস করিলেই সাঁতার ক্রমশঃই সহজ হইয়া পড়িবে ও ভবিষ্যতে জল হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া পাড়ি দিতে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। বুক-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার বা অন্যান্য ধরণের সাঁতার পরে শিক্ষা করিলেই চলিবে। জীবন-ভেলা বা অন্য কোন দ্রব্যের সাহায্য লইবে না।

আর একটি দিকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। শিক্ষার সময় দক্ষিণ পদের সহিত বাম হস্ত এবং বাম পদের সহিত দক্ষিণ হস্তের বরাবর মিল রাখিয়া দেহের ভার সমান ভাবে বিভক্ত করিয়া সমান গতি রাখিবে। এই মিলযুক্ত পাড়ির উপর যে কোন আধুনিক দ্রুতগতি পাড়ি বসাইতে পারা যায়। অবৈজ্ঞানিক কৌশলযুক্ত বা দোষদুষ্ট পাড়িতে সারা জীবন চর্চ্চা করিলেও বড় সাঁতারু হইতে পারিবে না। যদিও নিত্য অভ্যাসের ফলে প্রতিযোগিতায় জয় হইতে পারে কিন্তু সাঁতারের শক্তি অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। বালক-বালিকাদিগকে অধিকক্ষণ জলের মধ্যে রাখা বা অধিক দূর পর্য্যন্ত সাঁতার কাটান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইহাতে শ্বাস-যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে ও শরীর বৃদ্ধির ক্রম-হ্রাস হইয়া যথেষ্ট ক্ষতি করিবে।

প্রত্যেক শিক্ষমান সাঁতারের শেষে ৫।৭ মিনিট জলের উপর নিশ্চল ভাবে ভাসিয়া থাকিতে অভ্যাস করিবে। প্রত্যহ সাঁতারের পূর্ব্বে উত্তম করিয়া সরিষার তৈল মর্দ্দন করিবে।

আমাদের দেশে সন্তরণ শিক্ষকের বড়ই অভাব। যাঁহারা বড় বড় সাঁতারু হইয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই স্বভাবজাত বা স্বভাবের দ্বারায় শিক্ষিত। আজ ২২।২৩ বৎসর ধরিয়া সন্তরণ-ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটিও উপযুক্ত সন্তরণ-শিক্ষক—যিনি সকল রকম পাড়ির সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত—সেরূপ দৃষ্টিগোচর হইল না।

## পাড়ি নির্ব্বাচন

প্রতিযোগিতার জন্য দূরত্ব নির্ণয় অর্থাৎ নিকট পাল্লা কিম্বা দূর পাল্লা সেটা কতকটা সাঁতারুর পাড়ি, দম্‌ ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আজকালকার দিনে ক্রল্‌ অর্থাৎ "ডুন্‌ পাড়ি" ব্যতীত কি নিকট পাল্লা, কি দূর পাল্লা কৃতিত্বের সহিত সাঁতার দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। এই ডুন্‌ পাড়িরও একটা শ্রেণী আছে। এক শ্রেণী ডুন্‌ পাড়ি দূর পাল্লায় যথেষ্ট সাহায্য করে এবং সাঁতারুও ক্লান্ত হয় না। আর এক শ্রেণী ডুন্‌ পাড়ি নিকট পাল্লা যাইয়া ক্ষিপ্রতার হ্রাস হয়। আমার মতে "চার-পদী ডুন্‌" পাড়ি সকলেরই শিক্ষা করা উচিত; কারণ এই একমাত্র পাড়ি যাহাতে নিকট এবং দূর পাল্লায় সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতি পাওয়া যায় এবং সাঁতারুও সহজে ক্লান্ত হয় না। এই পাড়ি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইলে সাঁতারুকে প্রত্যেক হস্ত-পদ ভঙ্গী, শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত মিল ও গতি সমান রাখিয়া নিয়মিতরূপে পরিশুদ্ধ ভাবে শিক্ষা করা প্রয়োজন—অবশ্য স্বভাবজাত সাঁতারুদিগের কথা স্বতন্ত্র। ধৈর্য্য ব্যতীত কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ

করা যায় না। ধৈর্য্যই একমাত্র অবলম্বন। যদি জলে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে সাঁতারু স্থলেই উক্ত পাড়িটিকে সতর্কতার সহিত একটির পর একটি অঙ্গ লইয়া ধীরে ধীরে অনুশীলন বা অভ্যাস করিয়া পরিশেষে সেই ভঙ্গীগুলি পুনরায় জলে পরীক্ষা করিবে। ইহা সময়সাপেক্ষ। সাঁতারুদের সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য, যাহারা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে, তাহারা যেন এই একমাত্র পাড়িতে উৎকর্ষ লাভ করে। কোন ক্রমেই পাড়ি পরিবর্ত্তন করিবে না। বিভিন্ন পাড়িব সাহায্যে ও পেশীর সঞ্চালনে শরীরের সহিত জলের সমতা হারাইয়া মূল পাড়িও নষ্ট হইবার সম্ভবনা আছে। পাড়ি একবার জলে বসিয়া গেলে স্থলের অনুশীলন বন্ধ করিবে—ইহাতে ক্ষতি হইতে পারে।

(ক) চিহ্নিত চিত্র দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে কি উপায় অবলম্বন করিয়া স্থলে পাড়ির অনুশীলন করিতে হয়। যদি সাঁতারুর এই
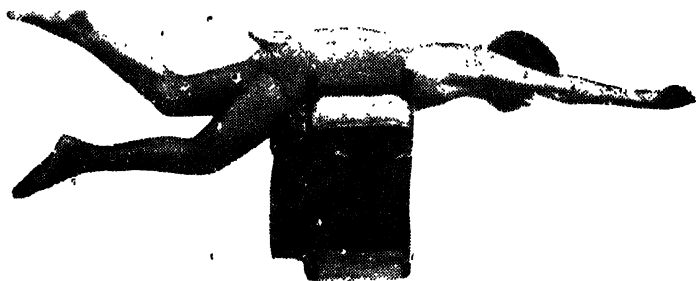
চিত্র—ক

স্থলে সন্তরণ অনুশীলনের ভঙ্গী, পাড়ি অনুশীলন

মিলযুক্ত পাড়ি সহজেই আসে, তাহা হইলে সাঁতারুর পক্ষে স্থলানুশীলন সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ ; কারণ ইহাতে উল্টা বিপত্তি ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। শিক্ষার্থী সাঁতার কাটিবার পূর্ব্বে প্রত্যহ ১০ হইতে ১৫ মিনিট

কাল পর্য্যন্ত এই চর্চ্চা করিয়া অবশেষে জলে পরীক্ষা করিতে পারিলেই ভাল হয়। প্রথমতঃ বাম পদের সহিত দক্ষিণ হস্ত, পরে দক্ষিণ পদের সহিত বাম হস্ত ও অবশেষে হস্ত ও পদের যুগপৎ অভ্যাসেরই নিয়ম। যতদিন পর্য্যন্ত পাড়িটি নিখুঁত ভাবে বসিয়া না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত

চিত্র—খ
সন্তরণারম্ভে ঝম্পপ্রয়োগ

চিত্র—গ
স্থলে সন্তরণ অনুশীলনের ভঙ্গী, দেহ ও স্কন্ধ সঞ্চালন

স্থলানুশীলন করা বিধেয়। পাড়ি বসিয়া যাইলে আধুনিক "ক্রল্ বা ক্রন্" পাড়ির চর্চ্চা করিলেই ভাল—অবশ্য যাঁহারা স্বভাবজাত সাঁতারু তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

(খ) চিহ্নিত চিত্রে সাঁতারের পূর্ব্বে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার কায়দা প্রদর্শিত হইয়াছে। সাঁতারু প্রথমতঃ সাঁতার-মঞ্চের প্রান্তে চিত্রানুযায়ী দুই পদ একত্রীভূত ও চিবুকের সোজাসুজি দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইবে। মনে মনে এক, দুই ও তিন গণিবার মধ্যকালে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। যাহাতে জলের নিম্নে দেহটি না চলিয়া যায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। প্রত্যহ সাঁতারের পরে ১০ হইতে ১৫ বার অভ্যাস করিতে পারিলেই ভাল। ঝম্পের পারদর্শিতা লাভ করা সাঁতারুর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নিকট পাল্লার বাজীতে হার-জিত অনেকটা ঝম্পের ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে।

(গ) চিহ্নিত চিত্রে কিরূপে দেহ ও স্কন্ধ পরিচালনার চর্চ্চা করিতে হয়, তাহা প্রদর্শন করা হইল। ইহা সন্তরণ-ক্ষেত্রে কৃতকার্য্যতার অন্যতম একটি কারণ। অনেক সাঁতারু স্কন্ধ ও দেহ পরিচালনার উৎকর্ষের অভাবে সহজেই পরিক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাঁহারা সাঁতার কাটিবার সময় অযথা শরীরকে টানিয়া লইয়া যায়। পাড়ির সহিত স্কন্ধের ও দেহের যে একটা স্বাভাবিক গতি আছে, তাহা তাহাদের আদৌ জানা নাই। সাঁতারু আর্সীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্কন্ধ ও দেহ পরিচালনা নিখুঁত ভাবে অনুশীলন কালে মুখ আর্সীর দিকে স্থির রাখিয়া এবং দুই পদ একত্রীভূত করিয়া শরীরকে শিথিল ভাবে চিত্রানুযায়ী দক্ষিণে এবং বামে যতদূর সম্ভব ঘুরাইবে।

(ঘ) চিহ্নিত চিত্রে সন্তরণ কালে জলের উপর নির্দ্দোষ দেহ-ভঙ্গী প্রদর্শন করা হইল। সাঁতারুকে হস্ত, পদ ও দেহ চিত্রানুযায়ী ঋজু ভাবে

চিত্র—ঘ

সন্তরণকালে নির্দোষ দেহ-ভঙ্গী, হস্ত-পদ ও দেহ এইরূপ ঋজুভাবে জলের উপর ভাসিবে

জলের উপর ভাসাইয়া যাহাতে জলের কোনরূপ বাধা না পায়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাড়ি দিতে হইবে

চিত্র—ঙ

সন্তরণকালে দোষযুক্ত দেহ-ভঙ্গী

(ঙ) চিহ্নিত চিত্রে সাঁতারুর দোষদুষ্ট দেহ প্রদর্শন করা হইল। চিত্রানুযায়ী দেহ লইয়া কদাচ সাঁতার কাটা উচিত নয়। ইহাতে সাঁতারু সহজেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে।

## ঘূরণ ও পাড়ির গতি বেগ নির্দ্ধারণ

প্রতিযোগিতা-কালে ক্ষিপ্রতার সহিত "ঘূরণ" ও গমন কালে পাড়ির "গতি বেগ" নির্দ্ধারণ করা চাই।

প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় বিশেষতঃ দূর-পাল্লায় "সম-গতি ও ক্রম-বৃদ্ধি"র প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সাঁতারের প্রথম হইতেই সাঁতারু নিজের ক্ষমতা ও দম্ বুঝিয়া সাঁতার সুরু করিবে। অপর পারের স্পর্শ-মঞ্চের নিকটবর্ত্তী আসিলেই সামান্য সাঁতারের গতি বৃদ্ধি করিয়া পুনরায় ঘূরণের পর ততখানি পথ—অর্থাৎ যে স্থান হইতে গতি বৃদ্ধি করা হইয়াছে—সেই গতি সমান রাখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে তফাৎ করিবে। এইরূপে ২।৪ বার সামান্য করিয়া তফাৎ করিতে পারিলেই প্রতিদ্বন্দ্বী নাগাল না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িবে। পুনরায় মধ্য-পথে সম-গতিতে নিজের দম্ বাঁচাইয়া সাঁতার কাটিবে। ক্ষিপ্রতার সহিত "ঘূরণ" সাঁতারের কৃতকার্য্যতার আর একটি কারণ। অনেক সময় সাঁতারুকে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; সাঁতারু প্রত্যহ সাঁতার অভ্যাসের পর অন্ততঃ পক্ষে ২।৪ বার মঞ্চের নিকটে ১০।১২ গজ পরিমাণ জলের মধ্যে ক্ষিপ্রতার সহিত ঘূরণ অভ্যাস করিলে কার্য্যক্ষেত্রে অনেকটা সুফল হয়।

## নিদ্রা

নিদ্রার প্রতি সাঁতারুর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পরিশ্রমজনিত শরীরের সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ একমাত্র সুনিদ্রাই দূর করিয়া পুনরায় শরীরকে সুস্থ, কর্ম্মঠ ও উপযোগী করিয়া তুলে। সন্তরণে সাফল্য লাভ করিতে হইলে কোনক্রমেই নিদ্রার হ্রাস বা ব্যাঘাত হইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক সাঁতারু অন্ততঃ পক্ষে ৮।১০ ঘণ্টাকাল নির্ব্বিবাদে নিদ্রা যাইবে। অবশ্য এমন সময়ে শয্যা গ্রহণ করিবে যাহাতে প্রত্যুষে উঠিতে পারা যায়। সাঁতারের অব্যবহিত পরেই অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল সমস্ত শরীরকে এলাইয়া দিয়া নিশ্চল ভাবে বিশ্রাম করিবে। সাঁতারুর

সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ৮ ঘণ্টাকাল নিদ্রা যাইয়াও যদি সে বুঝিতে পারে যে, দেহের অবসাদ বা ক্লান্তি দূর হয় নাই বা শরীরও কর্ম্মোপযোগী হয় নাই তাহা হইলে সেই দিবস সাঁতার বন্ধ রাখিবে। মনের অনিচ্ছা সত্বে কখনই সাঁতার অভ্যাস করিবে না। ইহাতে উন্নতি বা ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি হওয়া ত দূরের কথা বরং অবনতি ও ক্ষিপ্রতার হ্রাস হইবে। আমরা দেখিতে পাই স্থলে অর্দ্ধঘণ্টা ব্যায়ামে যে পরিমাণে পরিশ্রম হয় তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দূর হয়, কিন্তু সাঁতারে সম্পূর্ণ বিপরীত। অবগাহন স্নানে স্বভাবতঃই মানুষকে সহজে নিদ্রাভিভূত করে। যদিও সাঁতার আনন্দদায়ক জল-ক্রীড়া কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে অজ্ঞাত ভাবে যে কি ভীষণ পরিশ্রম হয় তাহা অনেক সময়ে সাঁতারুও বুঝিতে পারে না।

## খাদ্য

যেমন নিদ্রা ও পাড়ির প্রতি সাঁতারুর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য তেমনি খাদ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত। শরীরের শক্তি সঞ্চয় করিবে বলিয়া অযথা কতকগুলি গুরুপাক খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া পরিপাক যন্ত্রকে পীড়িত করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বাজারের খাদ্যদ্রব্য সর্ব্বদাই বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। স্মরণ রাখিবে ব্যায়ামবিদ্‌দিগের ন্যায় সাঁতারুর প্রচুর খাদ্য আবশ্যক হয় না। মৎস্য ও মাংসজাতীয় ব্যঞ্জন যত অল্প পরিমাণে ভক্ষণ করা যায় ততই মঙ্গল। সাঁতারুর পক্ষে চর্ব্বি উৎপাদক খাদ্য ভক্ষণ করা বিধেয়। কারণ অধিকক্ষণ জলে থাকায় শরীর হইতে চর্ব্বির হ্রাস বা ক্ষয় হয়। দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, মাখন ইত্যাদি আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যের সহিত, নিজের সহজ পরিপাক শক্তি অনুযায়ী ভক্ষণ করিবে। ভিজান ছোলার সহিত সামান্য মধু মিশাইয়া

হজমশক্তি অনুযায়ী খাইবে। এক মুষ্টি হইলেই ভাল। দৈনন্দিন সাঁতার অভ্যাসের অব্যবহিত পরেই উপরিলিখিত খাদ্যদ্রব্য কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবে। সামান্য পরিমাণে বাদামের সরবৎ সহ্য অনুযায়ী পান করিবে, পরিবর্ত্তিত ভাবে দুগ্ধ বৈকালে পান করিবে। ফল ও শাক-সব্জী প্রচুর ভক্ষণ করিতে পারা যায়। কোনক্রমেই খাদ্যের নিত্য পরিবর্ত্তন না হয়, সে বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। প্রতিযোগিতার দিন পর্য্যন্তও যেন নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়। প্রাত্যহিক খাদ্য, প্রতিযোগিতার দিবস ৪।৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিবে। ধূমপান, চা, কফি প্রভৃতির মাত্রা যত কম হয় ততই ভাল। মাদক দ্রব্য বিষবৎ পরিত্যজ্য।

## ব্যায়াম

সাঁতারুর পক্ষে গুরুতর ব্যায়াম যথা—বারে দোলা, ভার উত্তোলন করা ইত্যাদি, সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ; সাঁতার-জনিত যে সমস্ত পেশীর বিকাশ হয়, তাহা জলের সহিত সাঁতারুর সমতা বজায় রাখে। এই সমতা যতদিন থাকে, ততদিন সাঁতারু উত্তমরূপে সাঁতার কাটিতে সক্ষম হয়। মুহূর্ত্তের জন্য সমতা হারাইলে, তাহা পুনর্ব্বার লাভ করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠে। মল্ল-যোদ্ধা বা মুষ্টি-যোদ্ধার ন্যায় সাঁতারুর প্রচুর শক্তি সঞ্চয় আবশ্যক করে না। সাঁতারের যতটুকু শক্তির প্রয়োজন তাহা নিয়মিত সাঁতার হইতেই লাভ করা যায়। ইহা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া। বলিষ্ঠ ব্যক্তি হইলেই যে সাঁতারে জয়ী হইবে, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শীতকালে শরীরকে উপযুক্ত ও দম্‌রক্ষা করিবার জন্য সাঁতারুকে সামান্য ব্যায়াম-চর্চ্চাও রাখিতে হইবে। মধ্যে-মধ্যে সাঁতার কাটিতে পারিলেও ভাল হয়। শীতের সময় নৌকা পরিচালনা, লঘু মুদ্গর ঘুরান, ধীর দৌড়, দড়ি-ঝাঁপ

বা দূরপথ ভ্রমণ ইত্যাদি। লঘু ব্যায়াম একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। সাঁতারু সর্ব্বদাই মুক্ত বায়ু সেবন করিবে। জনতা-জনিত স্থান সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য। ঐ স্থানের দূষিত বায়ু অস্বাস্থ্যকর। ইহাতে দম্ হ্রাস হইবার সম্ভবনা আছে। সাঁতারু দেহের ওজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ নিয়মিত করিবে।

## শ্বাস-প্রশ্বাস

সাঁতারের প্রধান রহস্য শ্বাস-প্রশ্বাস নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনা। আমরা যেরূপ স্থলে শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া ঘুরিয়া বেড়াই, ঠিক সেইরূপ জলের মধ্যে এই শ্বাস-প্রশ্বাসের বলে, দীর্ঘকাল পরিশ্রান্ত না হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি। এখানে অনেক নামজাদা সাঁতারু দেখিতে পাই যাহারা এই শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া উপেক্ষা করিয়া পশুবলে সাঁতার কাটিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই শ্বাস-প্রশ্বাস যে সাঁতারের একটি অঙ্গবিশেষ তাহা তাহারা আদৌ জানে না। উত্তম সাঁতার কাটিতে হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিতে হইবে ; নচেৎ কখনই বড় সাঁতারু হইবার সম্ভাবনা নাই। এই ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমতঃ জলের উপর এরূপ ভাবে মুখ রাখিতে হইবে, যাহাতে মুখব্যাদান করিলে, মুখের মধ্যে জল প্রবেশ না করে। দ্বিতীয়, হাঁ করিয়া অর্থাৎ মুখ দিয়া নিশ্বাস লইয়া নাসিকার দ্বারা ধীরে ধীরে জলের মধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। মুখের দ্বারা নিশ্বাস লইয়া এবং নাসিকার দ্বারা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেই যে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবে তাহা নহে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যতখানি সময় নিশ্বাস লইবে, ঠিক ততখানি সময় নিশ্বাস ফেলিবে। এক দমে হুম্ করিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া দেওয়া কদাচ উচিত নয়। ইহাতে শ্বাস-যন্ত্র শীঘ্রই পীড়িত

হইয়া পড়িবে। অনেক অব্যবসায়ী বিলাতী পুস্তক অবলম্বনে এবং সাঁতার জিনিষটি উত্তমরূপে না বুঝিয়া সেই একঘেয়ে মামুলি কথা বলিয়া থাকে যে, "মুখ দিয়া শ্বাস লও এবং নাক দিয়া ফেল" কিন্তু শুধু এই কথা বলিলেই তো চলিবে না; নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইবার একটা সময়ও আছে এবং সেইটি শিক্ষার্থীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে।

যদি দক্ষিণ দিকে মুখ রাখা হয়—(সব সাঁতারুর মুখ একদিকে থাকে না এবং সাঁতারুর সাঁতার কাটিবার ধরণ, কায়দা বা চটক এক রকম নয়)—তাহা হইলে বাম হস্ত চালনার সহিত অর্থাৎ বাম হস্ত যেমন জলে পড়িয়া জল টানিবার উদ্যোগ করিতেছে ঠিক সেই সময়ের মধ্যে মুখ দিয়া নিশ্বাস লইবে এবং দক্ষিণ হস্ত চালনার সহিত অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত জলে গিয়া পড়িবার এবং জল টানার সহিত নাসিকায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে বরাবর ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকিবে। এই ক্রিয়া আরোপ করিতে পারিলেই সাঁতার ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসিবে এবং সাঁতারুও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া পরিশ্রান্ত হইবে না। যাহাদের মুখ বাম দিকে তাহারা দক্ষিণ হস্তের সহিত আরম্ভ করিয়া উপরোক্ত নিয়মে কাটিবে। যদি সাঁতারের সময় এই ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে ২।৪ দিবস পুষ্করিণীর পাড়ে বক্ষ-প্রমাণ জলে দাঁড়াইয়া অভ্যাস করিয়া পরিশেষে সাতারের সঙ্গে চেষ্টা করিলেই সহজেই আয়ত্তের মধ্যে আসিবে।
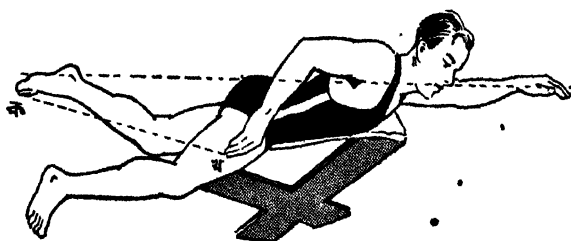
চিত্র—চ

চারপদী ডুব্-পাড়ির প্রথম ভঙ্গী

# ট্রাজান-ক্রল্

## বা

# চার-পদী দুন্

এতাবৎকাল যত প্রকার দুন্-পাড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চার-পদী দুন্ কম ক্লান্তিজনক। শোনা যায় "ট্রাজান" নামক কোন এক ইংরেজ নিজের নামানুসারে পাড়ির নাম রাখিয়াছিলেন। মিঃ ট্রাজান আমেরিকায় অসভ্য আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদিগের সাঁতার অনুকরণে ১৮৯৫ সালে ইংলণ্ডে প্রথম কাঁচি-পাড়ির প্রবর্ত্তন করেন। তিনি এই কাঁচি-পাড়ির সাহায্যে তদানীন্তন ইংলণ্ডের বড় বড় নামজাদা সাঁতারু—জার্‌ভে, ওয়েব্‌স্ ও নাটাল প্রভৃতি—সকলকেই পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে ইংলণ্ডে দোহাতি-পাড়ির বিশেষ প্রচলন ছিল না। অনেকেই পার্শ্ব-পাড়ি অর্থাৎ এক-হাতি পাড়িতে এবং বুক-পাড়িতে সাঁতার কাটিতেন। ইংলণ্ডে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত ট্রাজান প্রবর্ত্তিত কাঁচি-পাড়ির রেওয়াজ জোর চলিয়াছিল। কোন একটি বিশেষ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়ান ও আমেরিকান সাঁতারু-বৃন্দ আহুত হইয়া ইংলণ্ডে ক্রল্ বা দুন্-পাড়ির প্রবর্ত্তন করেন।

আমাদের দেশে মিঃ জেফর্ড, শ্রীযুক্ত মুরলীধর মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দত্ত, জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাঁতারুগণ পূর্ব্বে এই ধরণের পাড়িতে সাঁতার কাটিতেন। কিন্তু আজকালকার দিনে এই কাঁচি-পাড়ির সাহায্যে নিকট-পাল্লার প্রতিযোগিতায় ( অর্থাৎ ৫৫ গজ হইতে এক মাইল পর্য্যন্ত ) স্থান পাইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই। আজকাল দুন্-পাড়ির যুগ

আসিয়াছে ; অতএব আমি এখানে কাঁচি-পাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া উহারই রূপান্তরিত চার-পদী ডুব্-পাড়ি লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিব। এই পাড়ির সাহায্যে কি নিকট-পাল্লা, কি দূর-পাল্লা, সমান ক্ষিপ্রতা, গতিবেগ, আরাম ও স্বচ্ছন্দতার সহিত অনায়াসে যাইতে পারা যায়। শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার অব্যবহিত পরেই এই পাড়ির অনুশীলন করিবে। যদি প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক পাড়ির মিল থাকে তাহা হইলে স্থলানুশীলনের আবশ্যক করে না। সাঁতারু নিজের সুবিধামত একমাত্র পাড়িতে সাধনা করিবে। নিত্য পাড়ি পরিবর্ত্তন কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। এই সমস্ত বিষয়ে সন্তরণ-শিক্ষকদিগের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

## শিক্ষক

সন্তরণ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। অন্যান্য স্থল-ক্রীড়ার তুলনায় সাঁতারের বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষার্থীরা নিজের দোষ-দুষ্ট পাড়ি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইয়া অনেক সময় মারাত্মক ভুল করিয়া বসে। যদি ইহা শিক্ষার প্রথম হইতে সংশোধন করা না হয়, তাহা হইলে সেই দোষ চিরস্থায়ী হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করিতে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আমাদের দেশে শতকরা নিরানব্বুই জন অশুদ্ধ বা অবৈজ্ঞানিক কৌশলযুক্ত পাড়িতে সাঁতার দেয়। তাহাদের মনে মনে এইরূপ ধারণা যে সাঁতারের মধ্যে শিক্ষা করিবার কিছুই নাই। এটা সম্পূর্ণ ভুল। অপর দিকে তাহাদের সহজ ও সরল পথ প্রদর্শন করাইবার উপযুক্ত শিক্ষকও পরিদৃষ্ট হয় না। শিক্ষার্থী যদি সুদক্ষ শিক্ষক না পায়, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তব্য
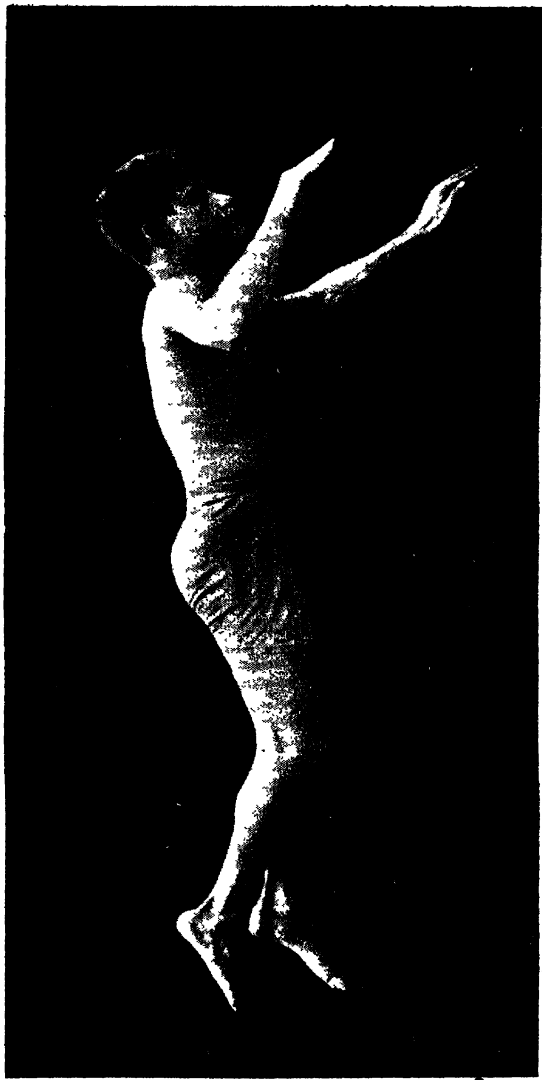
চারপদীর ডুন পাড়ির দ্বিতীয় ভঙ্গী।

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর উত্তম সাঁতারুর সাঁতার কাটিবার কায়দা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুস্তকের উপদেশানুযায়ী চলা। সুদক্ষ শিক্ষকের অধীনেই শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক। শিক্ষকের কর্ত্তব্য প্রথমতঃ পাড়িগুলির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া পরিশেষে নূতন শিক্ষার্থীদিগকে দোষ-গুণ প্রদর্শন করাইয়া সংশোধন করা। সাঁতারুর দেহে, গতিবেগের কোন্ অংশে দোষ হইতেছে বা কোন্ অংশ নিয়মিতরূপে সঞ্চারিত হইতেছে না, বা কি উপায়ের দ্বারা সহজপথ সরলভাবে প্রদর্শিত করা যায় তাহা জানা চাই। এই জন্যই বলিতেছি সাঁতারুর উচিত সুদক্ষ শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা করা।

## পাড়ি

বাহুর ক্রিয়ার জন্য দেহকে জলের উপর ঋজুভাবে ভাসাইয়া, হাত দু'টি মাথার উপর লম্বাভাবে নিক্ষেপ করিবে। জল টানিবার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি জুড়িয়া, তালু দিয়া গম্ভীরভাবে শেষ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ যতদূর পিছনদিকে যাইতে পারে টানিবে। ইহাই পাড়ির প্রথম ও শেষ। জল ধরিবার সময় দেহকে কিঞ্চিৎ গড়াইয়া দিয়া, মাথা হেলাইয়া মুখ জলের উপর আসিলেই নিশ্বাস গ্রহণ করিবে। এই সময় হাতের কনুই শক্ত রাখিয়া, কব্জি অল্পমাত্রায় নীচের দিকে বাঁকাইয়া সোজাসুজি উরুদেশের শেষ পর্য্যন্ত হাত আনিবে, অবশেষে কনুই বাঁকাইয়া জলের উপর টানিয়া তুলিবে। সমস্ত পাড়িটি টানিবার সময় এই নিয়মগুলি পালন করা বিধেয়। পাড়ি কোন্ স্থান হইতে কি ভাবে সুরু হইবে তাহা 'চ' চিহ্নিত চিত্রে প্রদর্শন করা হইয়াছে। যদি দক্ষিণ দিকে মুখ রাখা হয় তাহা হইলে বাম পদের আঘাতের সহিত পাড়ি সুরু করিবে।

বাম হস্তের দিকে মুখ রাখিলে দক্ষিণ পদের আঘাতের সহিত সুরু করিবে। প্রতিক্ষেপে চারটী করিয়া পায়ের আঘাত ও দুইটী করিয়া হাত-পাড়ি চলিবে। এখানে 'চ' চিহ্নিত ছবিতে দক্ষিণ হস্তের দিকে মুখ রাখা হইয়াছে, অতএব বাম পদের দ্বারা পাড়ি সুরু করা যাক্। প্রথমতঃ দেহটী জলের উপর ঋজুভাবে রাখিয়া বাম পদটী ৮ হইতে ১০ ইঞ্চি পৃথক করিয়া জোরে **এক** বলিয়া একটী আঘাত দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ২, ৩, ৪ আঘাত দিবে। এই আঘাতগুলি এক হইতে চার পর্য্যন্ত মনে মনে গণনা করিতে পারিলে ভাল হয়। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত **এক** হইতে পাড়ি সুরু হইতেছে। **এক** আঘাতের সময় দক্ষিণ হস্তটী চিত্রানুযায়ী উরুর নিকট রাখিবে। যে মুহূর্ত্তে পায়ের **এক** আঘাত হইবে সেই মুহূর্ত্তে দক্ষিণ হস্ত লম্বাভাবে নিক্ষেপ করিয়া বাম হস্তের দ্বারা জল টানিতে সুরু করিবে। সাঁতারুর স্মরণ রাখা উচিত, সাঁতারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিক্ষেপে পায়ের **এক** আঘাতের সহিত দক্ষিণ হস্ত নিক্ষেপ করিবে এবং ( ২; ৩, ৪ ) অর্থাৎ পায়ের চারটী আঘাতের সময়ের মধ্যে দুই হস্তের টানা শেষ করিয়া দক্ষিণ হস্ত যথাস্থানে আনিতে হইবে। এই নিয়মে ধীরে ধীরে পাড়ি বসাইতে হইবে। দ্রুত যাইবার জন্য কখনও ব্যস্ত হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি সাঁতারুর জলে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে পৃথকরূপে স্থলে ও জলে অনুশীলন করিয়া পরে একসঙ্গে মিলাইয়া লইবে।

## পার্শ্ব-নির্ব্বাচন

পার্শ্ব-নির্ব্বাচনের কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। দেহের কোন্ পাশ দিয়া সাঁতার কাটিতে হইবে, তাহা অনেক সময় শিক্ষার্থীর নিজের সুবিধার উপর নির্ভর করে—যদি সাঁতারুর মনে হয়, দক্ষিণ দিক সুবিধা-

রপদীর ডুন পাড়ির তৃতীয় ভঙ্গী
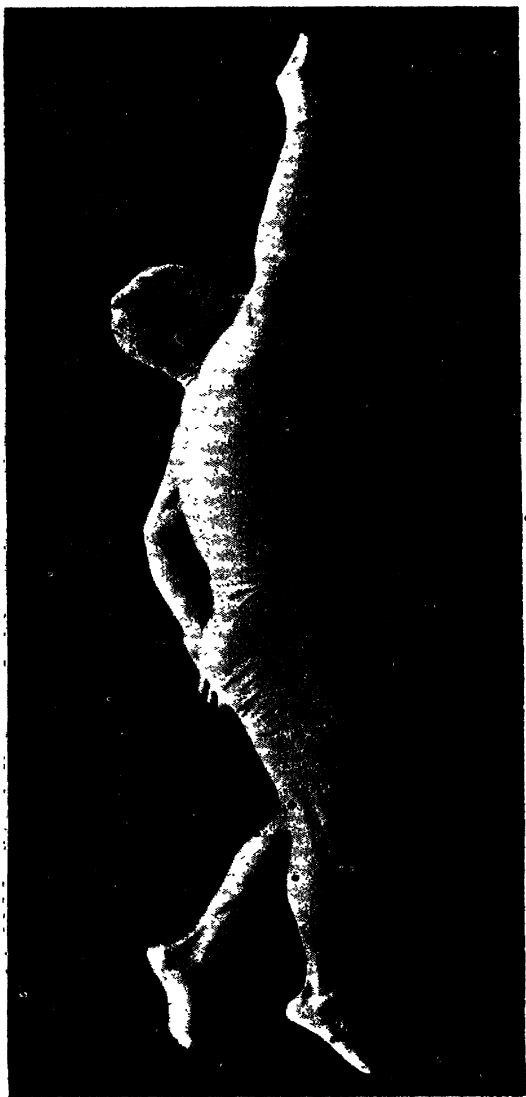
জনক ও আরামপ্রদ, তাহা হইলে ঐ দিক নির্ব্বাচন করিবে। যদি দুই পার্শ্বই কষ্ট ব্যতিরেকে ব্যবহার করিতে পারা যায় তাহা হইলে দক্ষিণ স্কন্ধ নিম্নে রাখিয়া, অর্থাৎ বাম দিকে মুখ রাখিয়া সাঁতার কাটা বিধেয়; কারণ এইরূপে সাঁতার কাটিলে হৃৎপিণ্ডের উপর চাপের মাত্রা অন্যান্য প্রণালীর তুলনায় অনেক পরিমাণে লাঘব করিয়া দিবে। তবে সাঁতারুর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, দূর-পাল্লা সাঁতার কাটিবার সময় দেহ রীতিমত হেলিতে দুলিতে থাকে, ইহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। সুতরাং এই সময় স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক দ্রুতগতিতে ঘুরাইয়া একহস্তে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া অপর হস্তে তাহা ত্যাগ করিবে। পাড়ির গতিবেগ বাড়াইবার জন্য কনুইকে কিঞ্চিৎ বাঁকাইতে পারিলে ভাল হয়। এই সময় সোজা নিম্নে না টানিয়া কনুই দু'টী পার্শ্বে কিঞ্চিৎ টানিয়া উরুদেশের নীচের পরিবর্ত্তে উরুর পার্শ্বে শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহাই হাত-পাড়ির প্রথম ও শেষ।

# শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ঘোষের কৃতিত্ব

## রেঙ্গুন রয়েল লেকে দীর্ঘকালব্যাপী সন্তরণ

## পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার

ইংরাজী ১৯৩৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় হেদুয়া পুষ্করিণীতে শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ঘোষ যে অবিরাম ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সাঁতার কাটিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সাঁতারের ২৪ দিনের মধ্যে প্রফুল্লকুমার পুনরায় রেঙ্গুন রয়েল লেকে একাদিক্রমে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট সাঁতার কাটিয়া পৃথিবীর সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছেন। রেঙ্গুনে সাঁতার কাটিবার বিশেষ কারণ, "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকা হেদুয়ার সাঁতারটি গ্রাহ্য করেন নাই, এবং বলেন সাঁতারের পরিদর্শনের ভার সমিতির গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, অতএব ইহা সরকারী ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমি দেশীয় সংবাদপত্রের মারফতে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, এবং প্রমাণ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম যে উক্ত সাঁতার সরকারী ভাবে নিশ্চয় গ্রহণ করা যাইতে পারে; কারণ এই বিরামহীন সাঁতার পৃথিবীর যে কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা স্থানীয় সমিতি বা সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিদিগের সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়াছে। কখন কোন কালে, কোন ক্ষেত্রেই অলিম্পিক্ এ্যাসোসিয়েসন্ বা সুইমিং ফেডারেশন্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় নাই।

গত ৩১শে আশ্বিন মঙ্গলবার ইংরাজী ১৭ই অক্টোবর অমৃতবাজার

চারপদীর ডুন পার্ড্রির চতুর্থ ভঙ্গী।

পত্রিকায় আমি যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম তাহা পাঠকবর্গের জন্য এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

"অবিরাম সন্তরণে পৃথিবীর রেকর্ড ছিল ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট। মিস্ লটীমুর নাম্নী শ্বেতাঙ্গ মহিলা সন্তরণে এই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। "ষ্টেট্স্‌ম্যান" পত্রিকা (২৬শে, ২৭শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায়) এবং "ইংলিশম্যান" পত্রিকা (২৫শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায়) এবং "এড্‌ভান্স" পত্রিকা ৮ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট অফিসিয়াল্ রেকর্ড বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

রেঙ্গুন রয়েল্ লেক্-এর এক অংশে সমবেত জনতা

শ্রীমান প্রফুল্ল ঘোষ সম্প্রতি ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট অবিরাম সাঁতার কাটিয়াছেন। সুতরাং তিনি দাবী করিতেছেন যে, তিনিই পৃথিবীর রেকর্ড ভাঙ্গিয়াছেন। "ষ্টেট্স্‌ম্যান" পত্রিকা বলিতেছেন যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল

ঘোষের সন্তরণের আরম্ভ কোন কর্তৃস্থানীয় লোকের তত্ত্বাবধানে হয় নাই, সুতরাং প্রফুল্ল ঘোষের কৃতিত্বকে সরকারী ভাবে রেকর্ড বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আমি এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। শ্রীমান প্রফুল্ল ঘোষ ঠিক সময় লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি রিভলবারের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করেন। সাঁতার আরম্ভ করিবার সময় কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, বহু বিশেষজ্ঞ এবং বিচারকগণ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, মিঃ শৈলেশচন্দ্র পালিত (এটর্ণি-য়্যাট্-ল), কলিকাতার সেরিফ বদ্রিদাস গোয়েঙ্কার বিশেষ সেক্রেটারী এল্. কে, কুঠারী, নিখিল ভারত ওয়াটার-পোলো টিমের ক্যাপ্টেন মিঃ এন্, ঘোষ, প্রফেসর বিষ্ণু ঘোষ, ঢাকা "ইষ্ট বেঙ্গল টাইম্স্" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ চারু দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আমরা অলিম্পিকের বিচারক ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে এই উপলক্ষে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। "ষ্টেট্স্ম্যান" দুই দিন বিজ্ঞাপিত করিলেন যে পৃথিবীর সন্তরণ রেকর্ড ৭২ ঘণ্টা ২০ মিনিট, অথচ যে দিন প্রফুল্লকুমার এই রেকর্ড ভাঙ্গিলেন, সে দিনই আবার চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন যে পৃথিবীর রেকর্ড ৭৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট।

প্রফুল্লকুমার তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিবার পর প্রকাশিত হইল যে, পৃথিবীর সন্তরণের যে ৭৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট রেকর্ড তাহা জানাই ছিল। তবে শ্রীযুক্ত ঘোষকে ইহা জানান হয় নাই; কারণ শ্রীযুক্ত ঘোষ ইহাতে ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িতে পারেন।

"ষ্টেট্স্ম্যানের" এই আচরণ সম্বন্ধে এই বলা চলে যে তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ঘোষ ৭৫ ঘণ্টা অবিরাম সন্তরণের জন্য নামিয়াছিলেন এবং ঘোষ অবিরাম ১০০ ঘণ্টা সাঁতারের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

প্রফুল্লকুমার সন্তরণ কালে আবহাওয়ার দরুণ যে অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" উত্তমরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। একটি জিনিষ তাঁহারা লোক-চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান ঘোষ ৬৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কোন জীবন-রক্ষক ব্যতিরেকেই এবং কোন চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়াই সাঁতার কাটিয়াছিলেন।

৭৫ ঘণ্টাব্যাপী অবিরাম সাঁতারের পরও অক্লান্ত

এই সাঁতারের রেকর্ড পাইয়া সংবাদপত্রে নানারূপ সমালোচনাও হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গ নিশ্চয় অবগত আছেন। আমি এখানে মূল ঘটনাটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রথমতঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সাঁতার আরম্ভ করিবার দিন ধার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দিবস ন্যাশানাল সুইমিং ক্লাবের ওয়াটার-পোলোর ফাইন্যাল্ ম্যাচ ও বাৎসরিক সন্তরণ

প্রতিযোগিতার ২।১টি সাঁতারের প্রতিযোগিতা থাকায় কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ্ এক্জিকিউটিভ্ অফিসার মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জীর অনুরোধে দিন পিছাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। দিন পরিবর্ত্তনের সংবাদ সংবাদ পত্রে যথা সময়ে প্রকাশিতও হইয়াছিল। নানা কারণে ও প্রফুল্লকুমারের শারীরিক অসুস্থতার জন্য কার্ড বিলি করিয়া অনেককেই আমন্ত্রণ করিতে পারি নাই। কেবল মাত্র সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি, বেঙ্গল অলিম্পিকের বিচারক ও কলিকাতার প্রত্যেক সমিতির সেক্রেটারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদের দিক হইতে কোন ত্রুটি হয় নাই। প্রফুল্লকুমার ১০২ ডিগ্রী জ্বর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়া ঐ দিবস জলে নামিতে বাধ্য হইলেন, তাহার কারণ বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে হেদুয়ায় প্রফুল্লকুমার কি ভাবে অবতরণ করেন দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। অসুস্থতার জন্য প্রফুল্লকুমারকে ঐ দিবস জলে নামা হইতে নিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি দমিবার পাত্র নহেন। আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"আপনি নিশ্চন্ত থাকুন, আমি প্রাণ থাকিতে রেকর্ড ভঙ্গ না করিয়া জল হইতে উঠিব না। আমি হলপ করিয়া বলিতেছি যে আমি ৫০ ঘণ্টা আপনার কোন সাহায্য লইব না। আপনি তৃতীয় দিন হেদুয়ায় আসিবেন। আমায় একটু পায়ের ধূলা দিয়া যান ইত্যাদি।" অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জলে নামিতে আদেশ দিলাম। এই সাঁতারের তৃতীয় দিবস প্রত্যুষে ৫ ঘটিকার সময় প্রফুল্লকুমারের ডিলিরিয়াম আরম্ভ হয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া এবং কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট কাল অতিক্রম করিলেই. আমি জল হইতে প্রফুল্লকুমারকে উঠাইলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার ইয়ং সাহেব আসিয়া আমাকে বলিলেন,—"পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ

রেকর্ড ৭৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট—রুথ্ লিজ নাম্নী এক জার্ম্মান বালিকা কর্ত্তৃক কৃত। পাছে তোমরা ভয় পাও, সেই কারণে ঐ রেকর্ড সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। আমি গত রাত্রে বহু অনুসন্ধান করিয়া উক্ত রেকর্ড আনাইয়াছি ইত্যাদি।" আমি ইয়ং সাহেবের এ কথার অর্থ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমি এই কয়েকটি কথা ইয়ং সাহেবকে বলিলাম—"সাহেব, যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর চারা নাই। তবে প্রফুল্লকুমার জীবিত আছে ও হেদুয়ার জল এখনও শুকায় নাই।" সর্ব্বত্রই এই রেকর্ড লইয়া একটা তুমুল গণ্ডগোল চলিল। পরিশেষে মিঃ পঙ্কজ গুপ্ত, এ্যাড্‌ভান্সের স্পোর্টিং এডিটর তাঁহার 'এ্যাড্‌ভান্স' পত্রিকায় একটি সারগর্ভ সমালোচনা করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড ৬৮ ঘণ্টা—আর্থার রিজো কর্ত্তৃক কৃত, এবং ঐ রেকর্ড ইউরোপের সর্ব্বত্রই সরকারী ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এই সমালোচনার পর অনেকেরই সন্দেহ কাটিয়া গেল। সকলের সন্দেহ ঘুচাইবার জন্য আমরা স্থির করিলাম যে ভারতবর্ষের বাহিরে যে কোন জায়গায় নূতন রেকর্ড স্থাপন করিতেই হইবে। বহু তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, রেঙ্গুন চির-বসন্তের দেশ, অতএব আমরা ঐ স্থানেই সাঁতার কাটিব। প্রফুল্লকুমার গড়পার নিবাসী বরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট গিয়া রেঙ্গুনের নিয়োগী বাবুদের নামে একখানি পরিচয়-পত্র লইয়া রবিবার ১৫ই অক্টোবর সকাল আট ঘটিকার সময় বি, আই, এস্, এন্, কোম্পানীর "এ্যারোণ্ডা" জাহাজে করিয়া আউট্‌রাম ঘাট হইতে শুভযাত্রা করিলেন। পঞ্চম বর্ষীয় বালক রমেশ খাণ্ডেলওয়ালা ও বালিকা সাবিত্রী দেবী এবং কালিপদ রক্ষিত, ছন্নুলাল মুখার্জী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মণ্টু পাল এই তিনজন জীবন-রক্ষক হিসাবে প্রফুল্লকুমারের সহিত ঐ জাহাজে

যাত্রা করিল। ইহারা সকলেই সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য এবং ভাল সাঁতারু। আমার এবং প্রফুল্লের সহোদর নরেন্দ্রের উহাদের সহিত রেঙ্গুন যাইবার কথা ছিল, কিন্তু নানা কার্য্যবশতঃ আমাদের উভয়ের যাওয়া ঘটে নাই।

রবিবার আউট্‌রাম ঘাটের জেটিতে উহাদের বিদায় দিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিভিন্ন সমিতির সভ্যগণ উহাদের সকলকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিয়া আউট্‌রাম ঘাটের জেটি মুখরিত করিতে লাগিলেন। জাহাজ ঠিক আট ঘটিকার সময় বন্দর ছাড়িল। সকলেই ডেকের উপর ঝুঁকিয়া নমস্কার ও প্রতি নমস্কার করিতে লাগিল। যতক্ষণ জাহাজখানি ভাগীরথীর বুকে ভাসিতে দেখা গেল, ততক্ষণ আমরা জেটির উপরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে জাহাজখানি লোক-চক্ষুর অন্তরালে বিলীন হইয়া গেল!

মঙ্গলবার ১৭ই অক্টোবর বেলা ১ ঘটিকার সময় জাহাজখানি ক্রুকীং ষ্ট্রীট জেটিতে গিয়া ভিড়িল। পূর্ব্বেই জেটির উপরে প্রফুল্লকুমারকে দেখিবার জন্য প্রায় এক হাজার ছাত্র সমবেত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী। প্রফুল্লকুমার জাহাজ হইতে অবতরণ করিবামাত্রই ছাত্রের দল উহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ, পুলিশের কর্ম্মচারীগণ এবং নিয়োগী পরিবারের সকলেই প্রফুল্লকুমারকে জেটির উপর অভিনন্দিত করিলেন।

পরদিবস ১৮ই অক্টোবর বুধবার বেলা প্রায় ছয়টার সময় প্রফুল্লকুমার নিয়োগী ষ্টেটের সুদক্ষ ম্যানেজার মিঃ গাঙ্গুলীকে সঙ্গে লইয়া রেঙ্গুনের মেয়র সাহেব মিঃ ডুগ্যালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন এবং সেখান হইতে পুলিশ কমিশনার মিঃ হার্ডি, কর্পোরেশনের সেক্রেটারী

প্রফুল্লকুমার ঘোষ—সাঁতার কাটিতে কাটিতে দুগ্ধপান

মিঃ ক্যামারণ ও হাইকোর্টের বিচারক মিঃ মে-অ্যবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকলকেই এই সাঁতারের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। উহারা সকলেই আনন্দ চিত্তে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় রেঙ্গুন কর্পোরেশনের কাউন্সিল হলে মিঃ ডুগ্যালের সভাপতিত্বে একটি সভা হয় এবং ঐ সভার সভ্যদিগের মধ্য হইতে একটি কার্য্যনির্ব্বাহ-সভা গঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। রেঙ্গুন হাইকোর্টের বিচারকদ্বয় মিঃ মে-অ্যবু, মিঃ সেন, কর্পোরেশনের তরফ হইতে মিঃ ডুগ্যাল, মিঃ ক্যামেরণ, পুলিশ কমিশনার মিঃ হার্ডি, ইউনিভার্সিটির তরফ হইতে, মিঃ ইউ, সেট। ইউরোপীয়ান কোকাইন ক্লাবের তরফ হইতে, ক্লাবের সভাপতি মিঃ ই, এল্, ওয়াটার্স ইত্যাদি। ঐ কার্য্যকরী সভা এই অবিরাম সন্তরণের বিচারক, সময়-রক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করিল। প্রফুল্লকুমার ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাভঙ্গের পর প্রফুল্লকুমার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় রায় বাহাদুর হেমেন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি প্রফুল্ল ব্যতীত দলের সকলেরই তত্ত্বাবধানের ভার অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করিলেন। নিয়োগী বাবুরা প্রফুল্লকুমারকে ছাড়িলেন না, অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কমিশনার রোডে থাকিতে হইল।

২২শে অক্টোবর রবিবার প্রত্যূষে ৩ ঘটিকার সময় প্রফুল্লকুমার নিয়োগী বাবুদের বাটী হইতে নির্গত হইয়া দুর্গাবাড়ীতে পূজা-অর্চ্চনা সমাপন করিয়া লেক্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জীবন-রক্ষকগণ, রমেশ ও সাবিত্রী দেবী যথা সময়ে লেকে উপস্থিত ছিল। লেকের সম্মুখে একটি বৃহৎ তাঁবু খাটান হইয়াছিল। ঐস্থান হইতে সাঁতার সংক্রান্ত যাবতীয়

কার্য্য সম্পন্ন হইত। প্রফুল্লকুমারকে দেখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই হাজার হাজার দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই উৎসুক নেত্রে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রফুল্লকুমারের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রফুল্ল-কুমার সাঁতারের পোষাক পরিয়া তৈল ও চর্ব্বি মর্দ্দন করিয়া, দর্শকবৃন্দের সম্মুখে আসিয়া সকলকেই অভিবাদন করিলেন। অবশেষে মিঃ ডুগ্যাল

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষের ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সাঁতারের পর
রেঙ্গুনের মেয়র ডক্টর ডুগ্যালের সহিত করমর্দ্দন

ও মিঃ মে-অ্যাবুর সহিত একত্রে ফটো তুলিয়া বেলা ৮টা ৬ মিনিটের সময়, রমেশ ও সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় অভিবাদন করিতে করিতে জলে অবতরণ করিলেন। দর্শকরাও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ

জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লকুমার লেকের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাঁতার কাটিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। দিবসে তাঁহাকে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। রাত্রি ১১টার পর হইতে প্রফুল্লকুমার বৃহৎ মৎস্য, কচ্ছপ ও সর্প দ্বারা ঘন ঘন আক্রান্ত হইতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এই নির্ম্মম আক্রমণের সংবাদ জীবন-রক্ষক ও কর্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা ইহার কী উপায় করিতে পারেন? সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। অবশেষে ২।৩ খানি স্যাম্পান (বর্ম্মাদেশীয় ডিঙ্গী) আসিয়া উহার নিকটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কচ্ছপ তাড়াইতে লাগিল। হঠাৎ রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে জল ঠাণ্ডা বরফ হইয়া গেল। প্রফুল্লকুমারকে এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া সারারাত্রি সাঁতার কাটিতে হইল।

পরদিবস প্রত্যূষে অর্থাৎ ২৩শে অক্টোবর রবিবার বেলা ৬ ঘটিকার সময় বৃষ্টি থামিল। প্রফুল্লকুমারের সমস্ত শরীর ঠাণ্ডায় জমিয়া গেল। পাঁজরার ভিতর সূচিভেদের ন্যায় তীব্র যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন। মুখের আকৃতি দেখিয়া জীবন-রক্ষক উঁহার শরীর ও জলের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রফুল্লকুমার বলিলেন যে ৫০ ঘণ্টা কাল পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। কারণ ঝড়ো হাওয়ার জন্য জল ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। বেলা প্রায় ১২টার সময় রৌদ্র দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জলও গরম হইতে লাগিল। প্রফুল্লকুমার মনের বল ফিরিয়া পাইলেন এবং নূতন উদ্যমে পুনরায় জোরের সহিত সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় এই সমাচার সমস্ত সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে প্রায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হইল। তখন মাত্র ৩৪ ঘণ্টা পূর্ণ হইয়াছে।

২৪শে অক্টোবর সোমবার প্রাতে ৪৮ ঘণ্টা পূর্ণ হইল। জনসাধারণ সকলেই উহাকে জল হইতে উঠাইতে উৎসুক। সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা ঐ প্রস্তাবে নারাজ হইলেন। ৫০ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইবার পর যখন প্রফুল্লকুমারকে জল হইতে উঠাইবার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, তখন মহিলা দর্শকবৃন্দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের এই নিষ্ঠুর আচরণে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং অনেকেই কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিলেন। বেলা ৯ ঘটিকার সময় অনন্যোপায় হইয়া বর্ম্মিণীগণ দলে দলে প্যাগডায় (ধর্ম্ম-মন্দিরে) গিয়া প্রফুল্লকুমারের জীবনের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাই ঐ দিবস প্যাগডায় প্রায় ২০০০ টাকার ফুল বিক্রয় হইয়াছিল। ডাক্তার ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য-দিগের মধ্যে উহাকে দ্রুত উঠাইবার জন্য মতভেদ হইল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই প্রফুল্লকুমারকে জল হইতে উঠাইতে পারিবেন না। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় প্রায় তিন লক্ষ লোক লেকের ধারে সমবেত হইয়াছিল। পথ-ঘাট প্রায় সমস্তই বন্ধ। সহরের মধ্যে অনেক দোকান ইতিমধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘোড়ার গাড়ী, ট্যাক্সী, ঘরের মোটর, রিক্স, বাস্, ট্রাম, মোট কথা যত রকমের যান রেঙ্গুন সহরে আছে সবই লেক অভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

রেঙ্গুনের প্রাচীন অধিবাসীদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহারা এইরূপ জনসমাগম পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই বা প্রাচীনতমদিগের নিকট হইতেও কখনও নাকি শুনেন নাই। ঐ দিবস সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে ৫০ খানি স্যাম্পান পুষ্পমাল্যে ও আলোক-মালায় সুসজ্জিত হইয়া, নানাজাতীয় বাদ্য-যন্ত্রে পরিপূর্ণ হইয়া ও নানাজাতীয় সুন্দরী

মহিলাদিগকে বহন করিয়া প্রফুল্লকুমারকে উৎসাহিত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আসিলেন। অপর দিকে ২০ খানি স্যাম্পান একত্র করিয়া তক্তার দ্বারায় একটি সুসজ্জিত মঞ্চ নির্ম্মাণ করিলেন। বর্ম্মীসুন্দরীগণ এই মঞ্চের উপর পোয়ে (নৃত্য) আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেহ কেহ আতসবাজী ও পটকা ফোটাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই জয়ধ্বনিসূচক শব্দ। বর্ম্মা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একসঙ্গে এই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লকুমার কিছুক্ষণের জন্য "আবুহোসেন" হইয়াছিলেন—এটি প্রফুল্লকুমারের কথা উদ্ধৃত করিলুম। চতুর্দ্দিকেই উৎসব। বড় বড় সার্চ্চ-লাইটে লেকের চারিদিক আলোকিত হইতেছে। যখন এই জলীয় উৎসব পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছিল, তখন স্যাম্পেনের মধ্যে কোন্ আরোহী নৃত্য করিবে বা বাজাইবে ইহা লইয়া একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। জলের মধ্যে এইরূপ বাদ-বিসম্বাদ দেখিয়া প্রফুল্লকুমার স্বয়ং উহাদের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন—আর কোন গোলমাল হইল না। ঐ দিবস রাত্রি তিন ঘটিকার পর প্রফুল্লকুমার ডিলিরিয়ামের আভাষ পাইয়া, অবিলম্বেই জীবন-রক্ষক ছন্নুলালকে ডাকিয়া শরীরের অবস্থার কথা বুঝাইয়া দিল। ছন্নুলাল তৎক্ষণাৎ বরফপূর্ণ একটি থালি আনিয়া উহার হস্তে দিল। প্রফুল্লকুমার ঐ বরফপূর্ণ থালটি এক হাতে মাথায় করিয়া অপর হাতে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিলেন। দর্শকেরা এইরূপ অদ্ভুত সাঁতার কাটিবার ভঙ্গী দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও প্রফুল্লকুমারের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া যাহাতে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিতে পারে তজ্জন্য উহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লকুমার এইরূপে ঘণ্টাখানেক কাটাইবার পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। এদিকে ছন্নুলাল দশ-বারো হাত দূরে থাকিয়া নানারূপ খোস-গল্প আরম্ভ করিয়া উহাকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দেরাও আনন্দে আত্মহারা হইয়া, এক-বুক

প্রফুল্লকুমার ঘোষ—৭৫ ঘণ্টা সন্তরণের পর পা ছড়াইয়া ভাসমান

জলে অবতরণ করিয়া সারারাত্রি প্রফুল্লকুমারকে নানাভাবে উৎসাহিত করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। ধন্য বর্মাবাসী! আজ তাঁহাদেরই

উৎসাহের জন্য প্রফল্লকুমার এই নূতন রেকর্ড সংস্থাপন করিয়া বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। আজ আমরা আজীবন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। ধন্য জীবন-রক্ষকের দল! তোমরা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছ, বাস্তবিকই তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।

২৫শে অক্টোবর মঙ্গলবার, প্রাতে ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট উত্তীর্ণ হইবার পর সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে প্রফুল্লকুমার ৭৫ ঘণ্টা সাঁতার কাটিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়া দিলেন। জার্ম্মান বালিকা রুথ্ লিজের ৭৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট সময় অতিক্রম করিবার পর ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ করিয়া সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, পৃথিবীর দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণের রেকর্ড ভঙ্গ হইয়াছে। এই সময়ে রয়টারের প্রতিনিধি আসিয়া প্রফুল্লকুমারকে জানাইলেন যে, তিনি এইমাত্র সংবাদ পাইয়াছেন যে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড ৭৯ ঘণ্টা, ঐ রুথ্ লিজ কর্ত্তৃক কৃত—অবশ্য মিঃ পঙ্কজ গুপ্ত, বিলাতের ডেলি এক্সপ্রেস্ ও নিউজ অফ্ দি ওয়ার্লডের মতে এই রেকর্ড ইউরোপে গ্রাহ্য হয় নাই। প্রফুল্ল ঘোষ দমিবার পাত্র নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে আজ ৮০ ঘণ্টা সাঁতার দেখাইয়া বর্ম্মাবাসীদের চমৎকৃত করিবেন। এই সংবাদ চতুর্দ্দিকেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। স্কুল, কলেজ, আফিস, দোকান, সমস্তই যুগপৎ বন্ধ হইয়া গেল। গৃহস্থেরা লতা-পাতা ও আলোক মালায় স্ব স্ব গৃহ নিপুণতার সহিত সজ্জিত করিতে লাগিলেন। সহরময় একটা মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। এই অবিরাম সন্তরণ দেখিবার জন্য বহু দূর-দেশ হইতে বর্ম্মান ও বর্ম্মিনীগণ আসিয়াছিলেন। বেলা ৩ ঘটিকার সময় পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হইতেই সঙ্গে সঙ্গে নিম্নগামী স্রোতের বেগ বাড়িতে লাগিল এবং জল প্রথম রাত্রির মতন শীতল হইতে লাগিল। ঠাণ্ডা-বশতঃ প্রফুল্লকুমারের

প্রফুল্লকুমার ঘোষ—সাঁতার শেষে সবেগে ধাবন

হৃদ্‌যন্ত্রে ঘন ঘন আঘাত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঈষৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ অবস্থায় ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট সাঁতার কাটিয়া পৃথিবীর নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়া জল হইতে উঠিবার জন্য স্বয়ং ইঙ্গিত করিলেন। কর্তৃপক্ষের আদেশ পাইবামাত্র প্রফুল্লকুমার দুই হাতে সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিলেন এবং কাহারও সাহায্য না লইয়া বরাবর পায়ে হাঁটিয়া ষ্ট্রেচারের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন বেলা ৪টা। প্রফুল্ল-কুমারের এই অসম্ভবপর কার্য্যকলাপ দেখিয়া রেঙ্গুনবাসী সকলে বিস্মিত, চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই একবাক্যে উঁহাকে জল-দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। এই চারিদিন সাঁতারের মধ্যে অনেকেই প্রফুল্লকুমারের ফটো লইয়া বহু অর্থ দিয়াছিলেন। এমন কি কুরুঙ্গী রিক্সওয়ালারা পর্য্যন্তও দু'চার আনা পয়সা দিয়া ছবি ক্রয় করিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারা তাঁহাদের দেহ হইতে অলঙ্কারও পর্য্যন্ত খুলিয়া দিয়াছিলেন। বাস্তবিক এরূপ উৎসাহ কুত্রাপি দেখি নাই। এই সমস্ত অর্থ অধিকাংশই পর-হস্তগত হইয়াছে। প্রফুল্লকুমার ঐ অর্থের একের-চৌষট্টি অংশও পান নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা সাঁতারের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে।

ষ্ট্রেচারে বসিবার পরমুহূর্ত্তেই মেয়র সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করি-লেন ও শরীরের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রফুল্লকুমার মৃদুস্বরে কহিলেন যে তাহাকে যেন হাঁসপাতালে লইয়া না যাওয়া হয়। সেই মুহূর্ত্তে এ্যাম্বুলেন্সে উঠাইয়া বরাবর কমিশনার রোডে নিয়োগী বাবুদের বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। ৩ ঘণ্টার মধ্যে প্রফুল্লকুমার পুনরায় সুস্থ শরীর লাভ করিলেন। অবশ্য ডাক্তারেরা তাঁহাকে ঐদিন একেবার উঠিতে দেন নাই। প্রফুল্লকুমার বিছানায় শুইয়া সকলের সঙ্গে গল্পগুজবে সময় কাটাইতে লাগিলেন। রাত্রে লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের খাদ্য খাইয়াছিলেন। সাঁতার শেষ হইবার পর দিবস হইতে প্রত্যহ ৪।৫

হাজার লোক নিয়োগী বাবুদের বাটির সম্মুখে দর্শনের জন্য জড়ো হইত। প্রফুল্লকুমারের রাস্তায় বাহির হইবার উপায় ছিল না।

পরদিবস ২৬শে অক্টোবর বুধবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রফুল্লকুমার কর্পোরেশন আফিসে মেয়র সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে গমন করিলেন। অবিলম্বেই এই সংবাদ সহরময় ছড়াইয়া পড়িল যে ঘোষ আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে ১০।১২ হাজার লোক দর্শনের জন্য কর্পোরেশন আফিস্ পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। সকলেই ঘোষের দীর্ঘ-জীবন কামনা করিয়া সমস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রফুল্লকুমারের লোকালয়ে বা রাস্তাঘাটে পায়ে হাঁটিয়া বহির্গত হওয়া তখন হইতে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সর্ব্বসাধারণের নিকট, বিশেষতঃ সন্তরণ সমিতির সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহাদের নিকট একটি প্রশ্ন করিতেছি, আশা করি তাঁহারা এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া আমাকে সুখী করিবেন। আমার প্রশ্ন এই যে, কলিকাতায় অবিরাম সাঁতারের সাঁতারুদের আমরা (জীবন-রক্ষকের দল) আবশ্যক মত স্বহস্তে সন্তরণকালে চর্ব্বি ও তৈল মর্দ্দন করিয়া দিই। ক্ষুধা পাইলে তাঁহাদের মুখে পানীয় ঢালিয়া দিই এবং শরীরের যন্ত্রণা হইলে এক হাতে সাঁতার কাটিয়া বা কখনও কখনও দাঁড় সাঁতার কাটিয়া দুই হাতে সাঁতারুর শরীর মালিশ করিয়া দিই। ডিলি-রিয়াম হইলে জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া সাঁতারুর মাথায় বরফপূর্ণ থলি ধরিয়া থাকি। এখানে উপরোক্ত নিয়ম এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু রেঙ্গুনে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা বা কর্ত্তৃপক্ষেরা অন্যরূপ নিয়ম করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা জীবন-রক্ষকের সাঁতারুর দেহ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে অনুমতি দেন নাই। এমন কি স্পর্শ করিলে সাঁতার নাকচ করিয়া দিবেন বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। প্রফুল্লকুমারকে স্বহস্তে

চর্ব্বি মাখিতে, চশমা পরিতে, দুগ্ধ পান করিতে এমন কি বরফের থলি পর্যন্তও মাথায় দিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত দ্রব্য সকল সাঁতারুর হস্তে পৌঁছাইয়া দিয়া জীবন-রক্ষকদের ১০ হাত দূরে থাকিতে হইয়াছিল এবং বিচারকদিগের নিকট হাত দেখাইয়া প্রমাণ করিতেও হইয়াছিল যে, সে সাঁতারুর দেহ স্পর্শ করে নাই। এখন আমরা কোন্ নিয়ম পালন করিব? এই অবিরাম সাঁতারের আজ পর্যন্ত কোন নিয়ম সৃষ্টি হয় নাই। এই পর্য্যন্ত মোটামুটি নিয়ম আছে যে, সাঁতারু জলের উপর এক জায়গায় মৃতের ন্যায় ভাসিয়া থাকিতে পারিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই অবিরাম সাঁতার অলিম্পিক্ বা কোন ফেডারেসনের অধীনস্ত নয়।

প্রফুল্লকুমার যে সময় রেঙ্গুন রয়েল লেকে সাঁতার দিতেছিলেন, সে সময় আমি কলিকাতায়। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান মণ্টু পালের নিকট হইতে উহাদের দৈনন্দিন কার্য্য-বিবরণী সম্বন্ধে একখানি করিয়া তার পাইতাম। বৃহস্পতিবার ২রা ডিসেম্বর প্রফুল্লকুমারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাইলাম যে, অবিলম্বেই আমাকে ও নরেন্দ্রকে "ওয়াটার পোলো" খেলয়াড়ের দলবল লইয়া রেঙ্গুন যাইতে হইবে। সমুদ্র যাত্রার কথায় মন নাচিয়া উঠিল। সেই রাত্রেই প্রফুল্লকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্র ও ক্লাবের সেক্রেটারী মিঃ চৈতন্য বড়াল মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্লাবের সহকারী সভাপতি মিঃ এন্, এন্, ভোঁস মহাশয়কে টেলিফোনে এই আনন্দ সংবাদ জানাইলাম। তিনিও সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদিগকে রেঙ্গুন যাত্রার অনুমতি দিলেন।

খেলোয়াড় হিসাবে গোঁসাই, হরিনারায়ণ ও বিভূতি সঙ্গে যাইবে স্থির হইল;—প্রফুল্লকুমারের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কমলাবালাও ধরিয়া বসিলেন যে তিনিও আমাদিগের সহিত রেঙ্গুন যাত্রা করিবেন। বিপদে পড়িলাম! একে জলপথ, তাহে ডেক্-যাত্রী! পথের কষ্টের কথা

তাঁহাকে বুঝাইলাম, কিন্তু নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। পরিশেষে "আচ্ছা দেখা যাবে" বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম। সেই সময় বধূমাতা আমাদের ৫১নং সিমলা ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আমার ভগ্নীর নিকট বাস করিতেছিলেন॥ রবিবার ৫ই ডিসেম্বর যাত্রার দিন ধার্য্য হইল। সকলের সহিত পরামর্শের পর স্থির হইল যে, আমাদেরই বাটী হইতে যাত্রা করা হইবে। প্রফুল্লকুমার তাহার দলবল সহ পূর্ব্বে আমাদেরই বাটী হইতে শুভযাত্রা করিয়াছিলেন। শনিবার রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত কতক্ষণে ভোর হইবে। রাত্রি ৪ ঘটিকা হইতে একবার ঘর একবার বারান্দা ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম—ঐ বুঝি কে এল! ঐ বুঝি কে ডাকে!!

প্রত্যূষে ছয় ঘটিকার সময় একে একে সকলেই আমার বাটীতে পূর্ব্বের কথা মত আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা সাত ঘটিকার সময় সানন্দ চিত্তে শুভযাত্রা করিলাম। আউট্রাম ঘাটের বুকিং আফিস হইতে ছয়খানি ডেকের টিকিট ক্রয় করিয়া, বন্ধু এবং বান্ধবীদের নিকট বিদায় লইয়া, বরাবর জাহাজে গিয়া উঠিলাম। বেলা আট ঘটিকার সময় "এ্যারোণ্ডা" বন্দর ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে এ্যারোণ্ডা এই বিরাট কলিকাতা নগরীকে পিছনে ফেলিয়া সগর্ব্বে ভাগীরথী বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সম্মুখে ছুটিয়া চলিল।

জাহাজে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। আমরা ডেকের যে দিকটা থাকিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলাম সেই দিকে যাত্রীর আধিক্য বশতঃ নরেন ও গোঁসাই তৎক্ষণাৎ জাহাজের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের থাকিবার জন্য একটা সুবন্দোবস্ত করাইয়া লইল। আমাদের পরিচয় পাইবা মাত্র ঐ কর্ম্মচারী-দিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া জাহাজের পিছন দিকে একটি পরিষ্কার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া চেন দিয়া বাঁধিয়া দিলেন,—যাহাতে অন্য কোন

ডেক-যাত্রী তথায় না প্রবেশ করিতে পারে। আমরা স্ব স্ব মালপত্র গুছাইয়া লইয়া ঐ চেন্ বেষ্টিত স্থানের মধ্যে শয্যা পাতিয়া ফেলিলাম। আমাদের মধ্যে সকলেরই এই প্রথম সমুদ্র-যাত্রা। সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া কবি সত্যেন দত্তের রচিত—"এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি, শান্তি, রবি, বড়্কু, যুগল—হুল্লড়েরি ভূমি"—গানখানি এক সঙ্গে ধরিল। আমি জাহাজের ডেকের উপর জাপানী নৌ-সেনাপতি এ্যাড্মিরাল টোগোর ন্যায় বীরদর্পে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া নিজেদের ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। মনে পড়িল একদিন এই বাঙালী জাতি তরঙ্গ-সঙ্কুল অসীম সমুদ্র-বক্ষে জাহাজে করিয়া বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত জল তোলাপাড় করিয়াছিল!

বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময়—ভাগীরথীর মোহনা পার হইয়া বিক্ষুব্ধ সাগর-বক্ষে জাহাজখানি গিয়া পড়িল। সামুদ্রিক পক্ষীরা এতক্ষণ জাহাজের পিছনে পিছনে চক্রোৎক্ষিপ্ত জলরাশির মধ্যে মৎস্য ধরিবার লোভে উড়িয়া আসিতেছিল; তাহারাও এইবার তীরাভিমুখে প্রস্থান করিল। জাহাজের খালাসীর নিকট শুনিলাম যে, ঐ সামুদ্রিক পক্ষীর ঝাঁক বেলাভূমি হইতে ৩০।৪০ মাইল পর্য্যন্ত মৎস্য সংগ্রহের জন্য জাহাজের পিছু পিছু আসিয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝিলাম যে, আমাদের জাহাজখানিও তীর হইতে ৩০।৪০ মাইল দূরে আসিয়াছে। এইবার ক্রমশঃ ঘোলা জল রূপান্তরিত হইয়া সবুজ জলে পরিণত হইল। মধ্যে মধ্যে ২।১টি কালো জলের ফালিও দেখা দিল। খালাসীকে ঐ স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিল যে গঙ্গাসাগর পার হইয়াছে। আমাদের সকলের মন আনন্দে দুলিয়া উঠিল, এবং সেই সঙ্গে জাহাজখানিও বেশ দুলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার বুঝিলাম যে আমাদের সামুদ্রিক জ্বর ধরিয়াছে। হরিনারায়ণ কালবিলম্ব না করিয়া বমি আরম্ভ করিয়া দিল।

আমি উহার ঐরূপ আচরণ দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বধূমাতা ও নরেন আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া "গুরুদেব, এ কি হইল, এ কি হইল!" বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিল না যে উপস্থিত ব্যাপারে গুরু-শিষ্যের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই!

রাত্রি দশটার সময় নরেন আমাদের আহারের জন্য ভাত ও মাংস লইয়া আসিল। পর দিবস প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলাম যে সকলের খাদ্য সমভাবে শয্যার পার্শে পড়িয়া রহিয়াছে। রাত্রে কেহ আহার স্পর্শও করে নাই। কোন রকমে গাত্রোত্থান করিয়া মদ্যপায়ীর ন্যায় টলিতে টলিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলাম। বেলা চারটার সময় জাহাজের একটি বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারের সহিত আলাপ হইল। তিনি আমার দুরবস্থা দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া আমার জন্য কিঞ্চিৎ চাট্‌নী প্রস্তুত করাইয়া আনিলেন। আমি সেই উপাদেয় চাট্‌নীর কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া কতকটা সুস্থ হইলাম। ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটিকে বলিলাম যে মহাশয় আপনারা তো বেশ আছেন। আপনাদের মাথাও ঘুরে না, দেহও ঘোলায় না বা পাও টলে না। তিনি উত্তরে বলিলেন আপনাদের এই প্রথম সমুদ্র-যাত্রা, সেইজন্য এইরূপ কষ্ট হইতেছে। আমি বলিলাম যে মহাশয়, পুরীতে সমুদ্রে যথেষ্ট সাঁতার কাটিয়াছি। বৃহৎ বৃহৎ তুফানের সহিত জলের মধ্যে থাকিয়া অকাতরে অক্লান্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু এ আমার কি হইল! ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটির মুখে শুনিলাম যে, রাত্রি বারোটা হইতে একটার মধ্যে জাহাজ "মার্‌টাবান" উপসাগরে পড়িলে দুলুকি বন্ধ হইবে এবং আমরাও কতকটা সুস্থ হইতে পারিব। শুনিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় শয্যা আশ্রয় করিলাম।

হঠাৎ দূরে আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখি, এক খণ্ড কালো মেঘ আকাশের এক প্রান্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই কালো

রেঙ্গুন ইউরোপীয়ান বোট্ ক্লাবে হাত ও পা বাঁধিয়া সন্তরণ কৌশল প্রদর্শন

মেঘ পূর্ব্বাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া যাত্রীর প্রাণে একটা উৎকট ভীতির সৃষ্টি করিল। আকাশ কালো, সমুদ্রের জলও কালো! দেখিতে দেখিতে

প্রবল বেগে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। খালাসীরা সত্বর ডেকের পর্দা ফেলিয়া দিল। জাহাজখানি নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ডেকের উপর জল উঠিতেই বধূমাতা শঙ্কিত চিত্তে আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমি তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "কোন ভয় নাই যদি জাহাজ মাঝ সমুদ্রে ডুবিও হয়, অন্ততঃ আপনাকে যে কোনো প্রকারেই হউক রক্ষা করা হইবে। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগে শয়ন করিয়া থাকুন।

আমাদের দলের মধ্যে একমাত্র গোঁসাই সামুদ্রিক-জ্বরের দ্বারায় আক্রান্ত হয় নাই। সে সর্ব্বদাই আনন্দে আছে। কখনও সহযাত্রীদিগের সহিত কলহ করিতেছে, কখনও বা তাঁহাদের ফল-ফুলারি চুরি করিয়া আনিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিতেছে এবং কখনও কখনও অন্যান্য সহযাত্রীদিগকেও খাওয়াইতেছে। এক ভদ্রলোক তাঁহার ক্যাম্পখাট রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে গোঁসাই সেই খাটিয়াটি সেই স্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া নিজের শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে দিব্য আরামে শয়ন করিয়া আছে। তাহার বালসুলভ দুষ্টামিতে যাত্রীগণ উদ্‌ব্যস্ত! গোঁসাইয়ের বিরুদ্ধে যাত্রীগণের নালিশ শুনিতে শুনিতে আমি অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে জোর করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া রাখিলাম।

রাত্রি বারোটার সময় জলীয় আলোক দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে ডেকের উপর বসিয়া আছি, এমন সময়ে ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটি আসিলেন এবং দূরে জলের উপর একটি আলো দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ বেসিন লাইট হাউস। ইহা সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। জাহাজের পরিচালককে সতর্কিত করিতেছে।" যদিও তখন জাহাজের দুল্‌কি একেবারে বন্ধ হইয়াছে তথাপি আমার ভালো নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল না।

পরদিবস বেলা বারোটার সময় নদীর মোহনায় আসিয়া পৌছিলাম। মোহনায় জাহাজখানি আসিয়া পৌঁছিলেই আমরা ডেক হইতে দূরে স্বর্ণময়ী বর্ম্মার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সোয়াড্যাগন প্যাগোডার স্বর্ণচূড়া দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলাম! মনে হইল যেন সেই স্বর্ণচূড়া সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে করিতে বলিতেছে, "হে আগন্তুকগণ! ত্বরায় আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর। আমরা বীরের পূজা করিতে কার্পণ্য করি না। আমরা এখনও আমাদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিই নাই। আমরা অল্পদিন মাত্র পরাধীন হইয়াছি।

বেলা প্রায় ২টা ৩০ মিনিটের সময় "এ্যারোণ্ডা" ক্রকীং ষ্ট্রীট জেটিতে আসিয়া ভিড়িল। জাহাজ ভিড়িতেই দেখিলাম যে প্রফুল্লকুমার তাহার দলবল লইয়া পূর্ব্ব হইতেই আমাদের জন্য জেটিতে অপেক্ষা করিতেছেন। অবতরণ করিতেই প্রফুল্লকুমার তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। জেটির নিম্নে ডাঃ চিট্‌উন (ব্যায়ামবীর) ও অন্যান্য স্থানীয় ভদ্রলোক সকলেই আমাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এই সাদর সম্ভাষণ শেষ হইলেই, আমরা মোটরে করিয়া ৪৯ ষ্ট্রীটস্থ "ডায়মণ্ড হাউস" অভিমুখে রওনা হইলাম। বধূমাতা প্রফুল্লকুমারের সহিত কমিসনার রোডে নিয়োগী বাবুদের বাটীতে গিয়া উঠিলেন। ডায়মণ্ড হাউসে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ, ফটোগ্রাফার ও স্থানীয় বহু ভদ্রলোক তথায় আমাদের আগমন প্রত্যাশায় সমবেত হইয়াছেন। সহরে প্রবল গুজব রটিয়াছে যে, প্রফুল্লকুমারের সন্তরণ-গুরু, (এই প্রবন্ধ লেখক) অদ্য "এ্যারেণ্ডায়" রেঙ্গুনে আসিয়াছেন; তিনি চারিদিন অগ্নিমধ্যে থাকিয়া তাঁহার অলৌকিক যোগশক্তি প্রদর্শন করাইয়া রেঙ্গুনবাসীকে চমৎকৃত করিবেন। এই উক্তির সত্যতা নিরূপণের জন্য লোকেদের আগ্রহের অন্ত নাই! এই

কার্য্য-সমাপ্তির পর

গুজবের ভিত্তিহীনতা স্থাপিত করিতে বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। আলাপ পরিচয়ের পর অভ্যাগতেরা প্রস্থান করিলে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইলাম। অপরাহ্নে ফটো তুলিবার পর সংবাদপত্রে রিপোর্ট দিয়া মোটরে করিয়া সহর পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত

হইলাম। দুই দিবস আমাদিগের কোন কার্য্য না থাকায় সেই অবসরে সহরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিদর্শন করিতে ও স্থানীয় অধিবাসী-দের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম।

আমি যে দিন রেঙ্গুনে গিয়া পোঁছিয়াছিলাম, সেই দিন প্রত্যুষে প্রফুল্ল-কুমার মিয়ংমিয়া হইতে সাঁতার প্রদর্শন করিয়া পুনরায় রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্তরণ প্রদর্শনের জন্য মিয়ংমিয়াতে কয়েক ঘণ্টা সমস্ত বিদ্যালয় ও দোকানপাট প্রফুল্লকুমারের সম্মানের জন্য বন্ধ হইয়াছিল। মিয়ংমিয়ার ডেপুটি কমিশনার সাহেব প্রফুল্লকুমারকে জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত মুদ্রাপূর্ণ একটি থলি পুরস্কার দিয়াছিলেন।

রেঙ্গুন সহরের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসার তরফ হইতে আমরা পৃথক নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। দৈনিক তালিকা অনুযায়ী ৬টি হইতে ৮টি পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। সময়াভাবে এবং গৃহে ফিরিবার প্রবল বাসনায় পেগু, মৌল্‌মিন্, বেসিন, মাণ্ডালে ও অন্যান্য সহরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সক্ষম হই নাই। তাঁহাদের নিকট পুনর্ব্বার আসিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি।

গত ৩০শে অক্টোবর, রেঙ্গুনে সর্ব্বজাতি প্রতিনিধিমূলক একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ ইউ, পুর সভাপতিত্বে বেঙ্গল একাডেমিতে এক বিরাট জনসভা হয়। এই সভা প্রফুল্লকুমারকে বিশেষভাবে সম্মানিত ও অভিনন্দিত করিয়াছিল।

রেঙ্গুন কর্পোরেশনের সদস্য মিঃ এস্, উজাম নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন —"রেঙ্গুন কর্পোরেশন অদ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষকে তাঁহার এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দিত করিতেছে। তিনি আজ অবিরাম সন্তরণে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।" এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ প্রফুল্লকুমারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই স্থানে একত্রে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ বাগ্‌লে (এম্‌-এল্‌-সি) বলেন—"মিঃ ঘোষ যদি অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন এবং সন্তরণে এইরূপ কৌশল দেখাইতেন, তবে তাঁহার নাম, যশ এবং সম্বর্দ্ধনা অন্য প্রকার হইত।"

মিঃ কিয়া মাইও (এম্‌-এল্‌-এ) বলেন—"মিঃ ঘোষের কৃতিত্ব আশ্চর্য্যজনক, শীঘ্র কেহ আর তাঁহার ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হইবে না।"

ডাঃ বাম্‌ (এম্‌-এল্‌-সি) বলিয়াছেন—"এইরূপ অনুষ্ঠানে রেঙ্গুনে কোন দিন এইরূপ ঔৎসুক্য দেখা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয় না।"

ডাঃ থিম্‌ মাং বলিয়াছেন—"দৈহিক শক্তিতে দুর্ব্বল বলিয়া যে জাতি পরিচিত, তাহাদের দলভুক্ত মিঃ ঘোষ যে সন্তরণে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড অতিক্রম করিয়াছেন ইহা অতিশয় প্রশংসনীয়।"

প্রফুল্লকুমার রেঙ্গুনে বিভিন্ন পুরুষ এবং নারী-সম্প্রদায় হইতে যে সকল "মানপত্র" পাইয়াছিলেন তাহার একখানি পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। আশা করি এই মানপত্র তাঁহাদের নিকট আদৃত হইবে।

বাঙালী-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত—"হে জগৎবরেণ্য সন্তরণ-বীর, তুমি সন্তরণ-ক্রীড়ায় যে অমানুষিক শক্তি ও অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছ, তাহা জগতে অতুলনীয়। অপরিসীম শ্রমসাধ্য অদ্ভুত সন্তরণ দক্ষতায় তুমি বিশ্বের শক্তির দরবারে স্বীয় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছ। আমরা প্রবাসী বাঙালী তোমার কৃতিত্বে, তোমার শ্রেষ্ঠত্বে, তোমার বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত।

বিজয়ী বীর, তুমি বীরত্বের সাধনায় বাঙালীকে বীরের আসনে বসাইয়াছ। বাঙালীর নিরুদ্ধ শক্তির উৎসমুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া তার জাতায় জীবনে একটি বিশিষ্ট বীর্য্যবত্তার প্রেরণা আনিয়া দিয়াছ। তার আত্মবোধ-শক্তির একদিক উদ্‌বুদ্ধ করিয়া দিয়াছ।

বাংলা মায়ের সুসন্তান, তোমার অতুল বীরত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এই প্রবাসে আমাদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাতে আমরা অশেষ ধন্য হইয়াছি।

জাতির সম্পদ, তুমি বিদেশে যাইতেছ। প্রবাসী বাঙালীর শুভেচ্ছা তোমার জয়যাত্রার পথে তোমায় বর্ম্মের ন্যায় ঘিরিয়া রাখিবে। দিকে দিকে তোমার কীর্ত্তিগাথা ছড়াইয়া পড়ুক, তোমার বিশিষ্ট সাধন ক্ষেত্রে বিশ্বজয়ী হইয়া বাংলা মায়ের শ্যামল কোলে তুমি সুস্থ দেহে সবল চিত্তে ফিরিয়া এস, ইহাই শ্রীভগবানের মঙ্গলময় চরণে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।”

অনেকেরই ধারণা আছে যে, কলিকাতার ব্যায়ামবীর দলের সহিত প্রফুল্লকুমারের আর্থিক ব্যাপার লইয়া একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। প্রফুল্লকুমারের যে কথাগুলি “এক্সএল্‌-সিয়রের” সভায় পঠিত হইয়াছিল তাহার বঙ্গানুবাদ এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

“আজ আমি দ্বিতীয়বার রেঙ্গুন সহরের এই বিপুল দর্শকবৃন্দের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছি। সন্তরণ কালে আপনারা আমাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তজ্জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, আমি আজ সন্তরণ সম্বন্ধে ২।১টি কথা আপনাদের বলিতে ইচ্ছা করি। সাঁতার যে কেবলমাত্র স্বাস্থ্যপূর্ণ আনন্দদায়ক ক্রীড়া-বিশেষ তাহা নহে। ইহার যথেষ্ট উপকারিতা ও

আবশ্যকতা আছে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহা সকলেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। আজ আমি সানন্দ চিত্তে আমার ভ্রাতা ব্যায়ামবীরদিগকে আপনাদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছি। ইঁহারা সকলেই কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশীয়। যদিও উঁহাদের দল ও আমাদের দল সম্পূর্ণ পৃথক, কিন্তু ক্রীড়া-ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এক প্রাণ ও এক মন। অদ্যকার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ মিঃ বিষ্ণু ঘোষের ব্যায়াম শিক্ষালয়ের উন্নতি-কল্পে ব্যয়িত হইবে। আমি আরও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত শান্তি পাল যিনি আমাকে এতাবৎকাল বিবিধ সন্তরণ-কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি আজ এ স্থলে উপস্থিত হইয়া আমাকে উৎসাহিত, অনুপ্রেরিত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন। আপনাদের এই সাদর অভ্যর্থনার জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।" এক্ষণে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদের মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্য হয় নাই এবং আমিও কলিকাতা হইতে এই ৯০০ মাইল দূরে তুচ্ছ বিবাদের জন্য যাই নাই।

মোট কথা, রেঙ্গুন সহরে আমরা যেরূপ সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছি তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। মনে পড়ে এক দিবস অপরাহ্ণে প্রফুল্ল ও আমি সোয়াডাগণ প্যাগোডায় গৌতম দর্শনের জন্য গিয়া অসংখ্য বর্ম্মিণী সুন্দরী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিলাম। এই সকল সুন্দরীগণ লোকপরম্পরায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে সেদিন ঘোষ প্যাগোডায় আসিবেন। সকলেই ঘোষের সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত। উঁহাদের অনেকেরই মনের ধারণা যে ঘোষ গৌতমের অংশবিশেষ। আমরা সকলেরই সৌজন্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে আকারে-ইঙ্গিতে কোন প্রকারে বুঝাইয়া দিলাম যে, আমরা তাঁহাদেরই মত সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। অন্য দিন সেণ্ট এ্যাণ্টনীর সান্ধ্য-সভা শেষ করিয়া ফাদারের একান্ত অনুরোধে

"ফ্যান্সী-ফেয়ার" পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত যাইলাম। মনে পড়ে সে স্থানেও এমন কোন "ষ্টল" ছিল না যাহা হইতে প্রফুল্লকুমারকে স্বেচ্ছায় একটি করিয়া উপহার দেওয়া হয় নাই। জামাল সাহেব ও বিচারপতি

(১) শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু, (২) প্রফুল্লকুমার ঘোষ, (৩) শান্তি পাল
৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট সন্তরণের পূর্ব্বে গৃহীত

সেন সাহেবের বাটীতে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিলাম। শেষোক্ত স্থানে প্রফুল্লকুমারের সাঁতারের কৌশলও প্রদর্শিত হইয়াছিল। রেঙ্গুন ইউনি-ভার্সিটি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সে স্থানেও সন্তরণ-কৌশল প্রদর্শন

করিয়াছিলাম এবং ইউনিভার্সিটি ছাত্রবৃন্দকে সাঁতারের আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বুঝাইতে চেষ্টাও করিয়াছিলাম। কোকাইন ক্লাবের কয়েক-জন খেলোয়াড়ের হঠাৎ অসুখের জন্য ওয়াটার-পোলো খেলার আয়োজন বন্ধ হইয়াছিল; সেই কারণে আমি, প্রফুল্ল, নরেন্দ্র, ছন্নুলাল ও বধূমাতা ব্যতীত সকলেই আমাদের পূর্ব্বে কলিকাতা ফিরিয়াছিল। আমরা আরও দুই সপ্তাহ রহিলাম।

রেঙ্গুনে তিনটি বৃহৎ হ্রদ আছে। রয়েল, কোকাইন ও লগা। শেষোক্ত হ্রদের জল সহরের পানীয় হিসাবে ব্যবহার হয়। ইহা ছাড়া সহরের মধ্যে কতকগুলি পুষ্করিণীও আছে। রেঙ্গুনবাসীদিগের এইরূপ সন্তরণে উৎসাহ দেখিয়া আমি ঐ সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা অনেক স্থলে বলিয়াছিলাম। অনেকেই আমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত হ্রদে বা পুষ্করিণীতে সন্তরণ শিক্ষার সমিতি স্থাপন করিয়া এই উপেক্ষিত স্বাস্থ্যপূর্ণ জল-ক্রীড়া রেঙ্গুনবাসীদিগের মধ্যে প্রচার করিবেন। কার্য্যে পরিণত হইলেই আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিব।

রেঙ্গুনে নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রফুল্লকুমারের হস্তগত হইয়াছে—

স্বর্ণপদক—৩০
রৌপ্যপদক—৫
কাপ ( বড় )—৫
কাপ ( ছোট )—৪
আংটী—১
স্বর্ণ-শাখা—১ জোড়া
সিগারেট কেস্ ( রৌপ্য )
নগদ মুদ্রা—৮০৲০৲

ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রফুল্লকুমার কর্ত্তৃক অবিরাম সন্তরণের তালিকা—

| | | |
|---|---|---|
| ১৯২৯ | কলিকাতা | ২৮ ঘণ্টা |
| ” | বর্দ্ধমান | ১২ ” |
| ১৯৩০ | বিষ্ণুপুর | ১০ ” |
| ” | বাঁকুড়া | ১৫ ” |
| ” | মৈমনসিং | ১২ ” |
| ” | কলিকাতা | ৬৭ ” ১০ মিঃ |
| ১৯৩১ | আন্দুল | ৫ ” |
| ” | কাল্না | ৫ ” |
| ” | সালখিয়া | ৫ ” |
| ” | দম্দম্ | ৫ ” |
| ১৯৩২ | কলিকাতা | ৬৬ ” ৪৮ মিঃ |
| ” | চট্টগ্রাম | ১২ ” |
| ” | খড়গপুর | ২৪ ” |
| ” | মেদিনীপুর | ২৪ ” |
| ” | খড়গপুর | ৫ ” |
| ” | তমলুক | ২৪ ” |
| ” | মহিষাদল | ২৪ ” |
| ” | বাঁকুড়া | ২৪ ” |
| ” | উলুবেড়িয়া | ২৪ ঘণ্টা |
| ” | মেদিনীপুর | ৫ ” |
| ” | পুরুলিয়া | ২৫ ” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯৩৩ | বেহালা | ২৪ ,, | |
| ,, | রাণাঘাট | ২৪ ,, | |
| ,, | কৃষ্ণনগর | ২৪ ,, | |
| ,, | উলুবেড়িয়া | ৩০ ,, | |
| ,, | চুঁচুড়া | ২৫ ,, | |
| ,, | কটক | ২৫ ,, | |
| ,, | কলিকাতা | ৭২ ,, | ১৮ মিঃ |
| ,, | রেঙ্গুন | ৭৯ ,, | ২৪ মিঃ |

১৯৩০ সালে কলিকাতায় ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট সাঁতার কাটিয়া আর্থার রিজো কর্ত্তৃক কৃত পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া প্রফুল্লকুমার কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

সহরের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন মোটেই আমাদের প্রাণস্পর্শ করিতে পারে নাই। কয়েকদিবস হইতেই গৃহে প্রত্যাগমনের প্রবল বাসনা আমাদের সকলকেই অত্যন্ত উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল; এমন সময়ে হঠাৎ কামায়ুধের বাঙালী মহিলা-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইলাম। কামায়ুধ রেঙ্গুন সহর হইতে ৫.৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটি বাঙালী পল্লী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই স্থানের অধিকাংশ অধিবাসীই কর্ম্মজিবী মধ্যবিত্ত বাঙালী।

রবিবার ২৪শে নভেম্বর সভার অধিবেশনের দিন ধার্য্য হইল। আমরাও ঐ দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় মহিলাবৃন্দ প্রফুল্লকুমার ও বধূমাতাকে হিন্দু সনাতন প্রথা অনুযায়ী সভা-মধ্যে বরণাদির দ্বারা যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন। চতুর্দ্দিক শঙ্খ ও হুলু-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণের জন্য মনে হইল, যেন আমরা বাংলা মায়েরই স্নেহকোমল ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছি। তাঁহাদের এই

আন্তরিকতা বহুকাল আমাদের স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া থাকিবে। ইহার পর যোগনের মহিলা-সমিতির সভ্যারাও প্রফুল্লকুমারের সাফল্যের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।

তাঁহাদের প্রদত্ত মানপত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"জগৎ বরেণ্য শ্রেষ্ঠ সন্তরণবীর, বাংলা মায়ের সুসন্তান, প্রিয় ভ্রাতা শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষ মহাশয়ের করকমলে—

প্রফুল্লকুমার, তোমাকে আমরা যথাবিহিত অভিবাদন করিতেছি, তুমি আজ দিগ্বিজয়ী বীর। তোমার বীরত্বে কেবল ব্রহ্ম বা বাংলাদেশ নহে, সমগ্র প্রাচ্যভূমি গৌরবান্বিত। অনেক কথা মনে হয়েছে জলমধ্যে তোমার বীরত্ব দেখে। বীরত্ব, বীরত্বই বটে; মনস্তত্ত্ববিদের চক্ষে সামরিক বা অন্যবিধ বীরত্বে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না; কাজেই মনে হয়েছে "বঙ্গের শেষ বীর" লেখার এখনও আমাদের সময় হয়েছিল না; মনে হয়েছে যক্ষ ও ভীমের জল-যুদ্ধের কথা; সর্ব্বোপরি মনে হয়েছে পাষাণ বক্ষে প্রহ্লাদের জলে ভেসে থাকার কথা এবং যুগপৎ মনে হয়েছে যোগলব্ধ শক্তির কথা, কেহ স্বীকার করুক বা না করুক আমরা একথা ঠিক জানি যোগসাধন ভিন্ন তোমার মত অত দীর্ঘকাল জলে থাকা সম্ভব হতেই পারে না। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তুমি এই কৃচ্ছ্রসাধনের নিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করেছ সে কথা বল্‌তে আমাদের এতটুকুও কুণ্ঠা আসে না।

ভগ্নী হিসাবে তোমার নিকট এক নিবেদন আছে আমাদের হিন্দু-মাত্রই নিমিত্ত স্বীকার করে। পাঞ্চজন্য হাতে বিষ্ণু যদি না রথাগ্রে সারথী-রূপে অধিষ্ঠিত থাকতেন, কে পার্থের ক্লৈব্য দূর করে যুদ্ধজয়ী হতে উদ্‌বুদ্ধ করতো তাঁকে? নিমিত্ত ভুলে গেলে চলবে না, ভাই। যে বাঙলা দেশ দশবৎসর পূর্ব্বেও ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, আজ নিমিত্ত ও

সারথীত্বে অবিশ্বাসী হয়ে সেই বাংলা হাল-ভাঙ্গা ডিঙ্গার মত বঙ্গোপ-সাগরের জলে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। তুমি যখন জলে সাঁতার কাট্‌ছ, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি তোমার অনুরক্ত বন্ধুগণ ডাঙায় ব'সে চিন্তা-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তোমার কথা মনে হলে তাদের সেই আকুলি-ব্যাকুলি এসে দাঁড়ায় চোখের সাম্‌নে। পরন্তু, এ কথাও মনে রেখো যে ব্যায়ামক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ নাই; জলে ও স্থলে ব্যায়াম—ব্যায়াম নামেই আখ্যায়িত হয়েছে এবং হবে। অযথা বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন কেউ আমাদের করতে চাইলে তার কথা আমরা স্বজাতিদ্রোহীর কথার মত উপেক্ষা করবো। শতধা বিভক্ত হয়ে যুগে যুগে ভুগে ভুগে আজ আমরা বড় ক্লান্ত। ভারতবাসীর এই ক্লান্তি বিদূরিতকরণ মানসে ভারত ললনা ব্রত-নিয়ম উদ্‌যাপন করেন। জগৎ সভায় ভাইরা মোদের মাথা তুলে দাঁড়ালে ভারতের মাতা ও ভগ্নীগণের ব্রত-নিয়ম সার্থক হবে। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আর নাই এই আমরা দেখতে চাই। বীরোত্তম! তুমি আয়ুষ্মান্ হয়ে প্রাচ্যের গরিমা পাশ্চাত্যে প্রচার করে ভারতের মুখোজ্জ্বল কর ও নিজে যশস্বী হও, এই আমাদের শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা।”

বৃহস্পতিবার ২৮শে নভেম্বর “আরাংকোলা” জাহাজে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার দিনস্থির হইল। আমরা গৃহে একখানি “তার” করিলাম। যাহাতে আমরা ঐ দিবস কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে না পারি, তজ্জন্য নিয়োগী বাবুরা এবং রায় বাহাদুর বদ্ধপরিকর হইলেন। ইঁহাদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, আমরা আরও কিছুকাল রেঙ্গুনে অবস্থান করি। এমন কি তাঁহারা আমাদের অগোচরে কলিকাতায় পৃথক তার প্রেরণ করিবার উদ্‌যোগও করিতেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের এই প্রগাঢ় স্নেহের অত্যাচারের হাত হইতে কোনোরূপে নিষ্কৃতি পাইয়া

পরদিবস যথা সময়ে জাহাজে আরোহণ করিলাম। অনন্যোপায় হইয়া ইঁহারাও আমাদের বিদায়-অভিনন্দনের জন্য ক্রকিং ষ্ট্রীট জেটিতে আসিলেন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় জাহাজখানি বন্দর ছাড়িল।

দেশ-প্রত্যাগত বিজেতা—মাল্যভূষিত প্রফুল্লকুমার ও তাঁহার পত্নী রেঙ্গুন সহরে সহজ সন্তরণে পৃথিবীর মধ্যে পরাকাষ্ঠা স্থাপনের পর কলিকাতায় পৌঁছিয়া মিঃ এস্, কে, ডেল্, এস্-পির সহিত করমর্দন

আমরাও ইঁহাদের স্নেহের কঠোর বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দেখিতে দেখিতে জাহাজখানি সহরকে পশ্চাতে ফেলিয়া মংকি-পয়েন্টের দিকে ছুটিল। ডেকের উপর দাঁড়াইয়া যতদুর দৃষ্টি চলে, ততদূর পর্য্যন্ত উঁহাদের হস্ত সঞ্চালিত বিদায়-সূচক রুমাল দেখিতে দেখিতে অবশেষে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলাম।

প্রত্যাগমন কালে জাহাজে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এবার সামুদ্রিক জ্বর আমাদিগের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া বোধ করি বিশাল সমুদ্র-গর্ভে আশ্রয় লইয়াছে। পথের একঘেয়েমী কাটাইবার জন্য অধিকাংশ সময় প্রফুল্লকুমার তাস খেলিয়া কাটাইতেন। আমি ঐ রস গ্রহণে অক্ষম হওয়ায় আমার দিন অতি কষ্টেই কাটিতে লাগিল। রবিবার প্রত্যুষে ৫ ঘটিকার সময় জাহাজ গঙ্গা-সাগরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কূলের দিগন্তব্যাপী শ্যামল ক্ষেত্র, বিচ্ছিন্ন তালীবন, ছোট ছোট আঁকা-বাঁকা গেঁয়োপথ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মনে মনে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। পথের ক্লান্তি এক নিমেষেই দূর হইয়া গেল। আনন্দে বিহ্বল হইয়া বিমুগ্ধ নেত্রে আমার বাংলা মায়ের পল্লী-মাধুরী দেখিতে দেখিতে গান ধরিলাম—"আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।" কত মধুর! কত স্নিগ্ধ এই বাংলাদেশ !!

বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় "আরাণকোলা" আউট্রাম ঘাটের জেটিতে আসিয়া ভিড়িল। আমরা পথিমধ্যে "পাইলট" বোটের কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, আউট্রাম ঘাটের জেটিতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। জাহাজখানি জেটিতে ভিড়িতেই আমাদের সমিতির অন্যতম সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কয়েকজন সমিতির বিশিষ্ট সভা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বরাবর জাহাজের উপরে আসিয়া প্রফুল্লকুমারকে

পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন। জেটি হইতে অবতরণ করিতেই উৎসাহী জনতা ও কলিকাতার বিভিন্ন সমিতির সভ্যবৃন্দ প্রফুল্লকুমারকে অভিনন্দিত করিলেন।

এই বিজয় উৎসব উপলক্ষে "শৈলেন্দ্র-স্মৃতি" সমিতির তরফ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু মহাশয়া ও বিলাতের পার্লামেণ্টের মহাসভার সভ্য মিঃ এইচ্, কে, হেল্স্ও আসিয়াছিলেন। মিঃ হেল্স্, এই দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণের জন্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম—"কমন্স সভার পক্ষ হইতে আমি আপনাকে বিজয় অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনার কার্য্যে ভারত তথা সমগ্র সাম্রাজ্য গৌরব বোধ করিতেছে" স্কুল অফ্ ফিজিক্যাল্ কাল্চারের অধ্যক্ষ আমাদের পরম সুহৃদ্ মিঃ জে, কে, শীলও ( মুষ্টি-যোদ্ধা ) এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

জাহাজ-ঘাটের অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর আমরা সমিতি অভিমুখে রওনা হইলাম। এখানে পূর্ব্বেই প্রফুল্লকুমারের বিজয়-গৌরবের জন্য কর্ত্তৃপক্ষেরা সমিতির প্রাঙ্গণও বিচিত্র আলিপনা, মঙ্গলঘট, ও আম্রশাখা প্রভৃতির দ্বারায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। দ্বারে প্রবেশ মাত্রই ঝম্পমঞ্চের উপর হইতে শানাইয়ের গুরু-গম্ভীর "ভৈঁরো-র" আলাপ আমাদের শুভাগমন-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে জ্ঞাপন করিল। সমিতির কুমারী-সাঁতারুবৃন্দ এই অবকাশে আমাদের সকলকেই পুষ্পমাল্য ও চন্দনের দ্বারায় বিভূষিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। এই চিত্তস্পর্শী দৃশ্যে আমার অন্তর বিচলিত হইল, মনের মধ্যে একটা বিশেষ রকম গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমাদের প্রত্যাগমনের প্রায় এক সপ্তাহ পরে "শৈলেন্দ্র-স্মৃতি"

সমিতির সভ্যেরা কলিকাতা "ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট" হলে সুহরবাসীর তরফ হইতে প্রফুল্লকুমারের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি বৃহৎ সভা আহ্বান

হেদুয়া সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃক সম্বর্দ্ধনা —
মধ্যস্থলে উপবিষ্ট (১) শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ, (২) তাঁহার পত্নী, (৩) শ্রীশান্তি পাল

করেন। এই সভার পৌরহিত্যের ভার রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ) মহোদয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং ভদ্রব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু মহাশয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত কণ্ঠে সভায় নিম্নলিখিত মান-পত্রখানি পাঠ করেন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তরণ বীর বঙ্গজননীর প্রিয় সন্তান প্রফুল্লকুমার ঘোষ করকমলেষু ( শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবের উদ্যোগে )—

"হে সন্তরণপটু বঙ্গবীর! আমরা তোমাকে স্বাগত জানাই।

তোমার আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও সহ্য গুণে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ, তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরাও যাহাতে ধৈর্য্য ও সহ্য শক্তিতে অনুপ্রাণিত হই। নিষ্ঠার সহিত অব্যহিত চিত্তে, দেশ মুখোজ্জ্বল করিতে ব্রতী হইতে পারি, সেই দীক্ষা দান করো। আমরা তোমাকে অভিনন্দন

তপস্যার শ্রেষ্ঠ অর্জ্জন, আত্মশক্তির বিকাশ, তিতিক্ষা তাহার প্রথম সোপান অধ্যবসায় ও সংযমের অধিকারী, হে তরুণ, আমরা ভক্তবৃন্দ তোমার অটুট স্বাস্থ্য কামনা করি।

তোমার চিত্তবল অপূর্ব্ব। সেই অতুলনীয় উৎকর্ষেই আজ আমাদেরও হৃতগৌরবের নব প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে। তুমি আমাদের বিস্মিত হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করো।

মঙ্গলময়ের চরণে সাধনার নিত্য প্রার্থনা, ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা-সন্তোষ দেহ। হে তপস্বীসমান সাধক, তোমার সে কামনা কখনো ব্যর্থ না হউক, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

যিনি চিরন্তন, যিনি ধর্ম্মলোক প্রকাশক সেই বরণীয় দেবতা, মাভৈঃ মন্ত্রে দীক্ষিত তোমাকে বরাভয় দান করুন, পার্থের ন্যায় তুমি ভুবনবিজয়ী হও।

হে সাহসের প্রতীক, মূর্ত্তরূপ, আমরা তোমাকে নমস্কার জানাই।"

কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ।

আজকাল সংবাদপত্রে সন্তরণের দ্বারা ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইংলিশ প্রণালীটিকে হেদুয়ার পুষ্করিণী বা কলিকাতার ভাগীরথীর অংশে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর, যিনি এক সময় ইংলণ্ডে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে ইংলিশ প্রণালী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে, উহা নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিতে হইলে বৎসর দুই রীতিমত শিক্ষাধীনে থাকিয়া ইংলিশ প্রণালীতে নিয়মিতরূপে সাঁতার অভ্যাস ও ঐ স্থানের আবহাওয়ার সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এতাবৎ কাল বাংলাদেশে যতগুলি সাঁতারু সৃষ্টি হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে "শ্মশানেশ্বর সন্তরণ-সমিতির" সভ্য শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র মালিক ও প্রফুল্লকুমারের মধ্যে সে শক্তির কতকাংশ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। উপস্থিত ক্ষেত্রে শেষোক্ত ব্যক্তিই বাংলাদেশে একমাত্র উপযুক্ত। প্রফুল্লকুমারের অবিচলিত ধৈর্য্য, মানসিক দৃঢ়তা, অদম্য উৎসাহ ও সহনশীলতার পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। মনে পড়ে ২৩ মাইল সন্তরণ কালে বৈদ্যবাটীর নিকট আসিয়া হঠাৎ উদরে খাল ধরিল, এমন সময়ে প্রফুল্লকুমার জল হইতে উঠিবার জন্য আমার অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি না পাইয়া এক হস্তে উদরের ব্যথিত অংশ চাপিয়া ধরিয়া অন্য হস্তে সাঁতার দিয়া বৈদ্যবাটী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলেন; বিচারকদিগের সুবিচারে তাঁহাকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইল। জে, পি, উল্‌ফ্ নামে একব্যক্তি ইংলিশ প্রণালীতে সপ্তমবার সাঁতার দিয়া অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হন নাই। বহু সাঁতারু স্রোতের করাল কবলের মধ্যে পড়িয়া অপর পারের তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই সমস্ত অভিজ্ঞ সাঁতারু দলের মধ্যে কেহ কেহ ৭০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া তীরে উঠিতে সক্ষম হন নাই। যদিচ ডোভার হইতে ক্যালের দূরত্ব ২১ মাইল মাত্র। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমস্তই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। এমন কোন সাঁতারু নাই, যিনি সদর্পে বলিতে পারেন যে, তিনি প্রথম চেষ্টাতেই অতিক্রম করিবেন। ইংলিশ প্রণালী সাঁতার দিয়া অতিক্রম করিবার উপযুক্ত সময় জুলাইয়ের প্রথম হইতে আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত।

রাজা মন্মথনাথ রায়ের সহিত একদিন সন্তরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি প্রফুল্লকুমার সম্বন্ধে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, আমার অন্যান্য ছাত্রেরা প্রফুল্লকুমারের সমকক্ষ হয় নাই কেন?

আমি রাজা সাহেবকে আমার অন্যান্য ছাত্রের সহিত প্রফুল্লকুমারের যে কি পার্থক্য তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার অন্যান্য ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই মাইল, অর্দ্ধ মাইল, সিকি মাইল, ২২০ গজ, ১১০ গজ, ওয়াটার-পোলো ডাইভিং ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় বহুবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা আমাদের সমিতির কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু একটা কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, হিন্দুস্থানী ভাষায় একটি কথা আছে—"গুরু মিলে লাখে লাখ, লেকিন্ চেলা মিলে এক।" এ কথাটি ধ্রুব সত্য। প্রফুল্লকুমারের একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, সাহস, বিশ্বাস এবং সর্ব্বশেষে অবিচলিত গুরুভক্তি আজ উঁহাকে জগতের সম্মুখে ধরিয়াছে।

আমার প্রতি উঁহার এরূপ বিশ্বাস যে, আমি সম্মুখে থাকিলে অসাধ্য সাধন করিতে তিনি এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন না। মনে আছে ১৯৩০ সালে যে বার ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট কাল অবিরাম সাঁতার দিয়াছিলেন,

সেই সময় একদিন প্রত্যূষে পঞ্জরের দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করায় আমাকে জলে নামাইয়া বলিয়াছিলেন—"গুরুদেব আপনার পা-দুটা আমার মস্তকে এবং বক্ষে একবার বুলাইয়া দিন এবং কিছুক্ষণের জন্য আমার নিকট থাকুন। আমি এই মুহূর্ত্তে আর্থার রিজোর সময় নির্দ্দেশ ভাঙ্গিয়া দিব।" তখন মাত্র ৬০ ঘণ্টা হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতে এরূপ অবিচল গুরুভক্তি সত্যই অতি বিরল! ধন্য প্রফুল্লকুমার!

প্রফুল্লকুমার দমিবার পাত্র নহেন। আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার এই ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সন্তরণের সময় নির্দ্দেশ শীঘ্রই ভঙ্গ হইবে এবং সেই সঙ্গে ১০০ ঘণ্টা নিরবসর সন্তরণের জন্য পুনরায় ঘোষণা করিবেন। যখন এই সময় নির্দ্দেশ ভঙ্গ হইল না, তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া অভিনব কৌশলে হাতকড়া বদ্ধ হইয়া ২৪ ঘণ্টা কাল সাঁতার কাটিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই ধরণের দীর্ঘকাল সাঁতার কাটা সন্তরণ ইতিহাসে প্রথম। আমরা মাত্র দুই-এক ঘণ্টার জন্য অভ্যাস করিয়াছিলাম। হঠাৎ ২৪ ঘণ্টার কথা উত্থাপন হইতেই আমি চিন্তিত হইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, একবার ১২ ঘণ্টার জন্য গোপনে পরীক্ষা করিয়া পরে ২৪ ঘণ্টার জন্য জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করিব। কিন্তু এই প্রস্তাব উত্থিত হওয়ায় প্রফুল্লকুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গুরুদেব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! আমি পি, কে, জি। আপনি ঝম্পমঞ্চের উপর চুপ করিয়া বসিয়া দেখুন আমি কি করি।" আমিও আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বলিলাম,—"তবে তাই হউক।"

শনিবার ৩১শে মার্চ্চ সাঁতারের দিন ধার্য্য হইল। ঐ দিবস কলিকাতার মেয়র এবং পুলিশের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক হাতকড়া বদ্ধ হইয়া বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ৫-৩৪ মিনিটে প্রফুল্লকুমার জলে অবতরণ করিলেন। সহস্র সহস্র দর্শক হেদুয়ার চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিয়া বিস্মিত নেত্রে প্রফুল্ল-

কুমারের এই অভিনব কৌশলযুক্ত হাতকড়াবদ্ধ অবস্থায় সন্তরণ দর্শন করিতে লাগিলেন। সুকুমার ভড়,—যিনি ৫০ ঘণ্টা একাদিক্রমে সন্তরণ দিয়াছিলেন—জীবন-রক্ষকরূপে প্রফুল্লকুমারের সহিত অবতরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পর দিবস অর্থাৎ রবিবার প্রাতে হঠাৎ রক্ত বমন করায় জল হইতে তাঁহাকে উঠাইতে বাধ্য হইলাম।

এই ঘটনার পর হইতে প্রফুল্লকুমার বিনা জীবন-রক্ষকে ২৪ ঘণ্টা কাল সহাস্য বদনে পরিপূর্ণ করিয়া রবিবার ৫-৪৪ মিনিটের সময় বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং জল হইতে সিঁড়ি বহিয়া মঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্যে সহস্র সহস্র দর্শক স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় আসিয়া হাতকড়া উন্মোচন করিয়া প্রফুল্লকুমারকে অভিনন্দিত করিলেন। শরীর হইতে চর্ব্বি বিমোচন করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য মুক্ত বাতাসে নৌকা-বিহার করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির মতো প্রফুল্লকুমার রাজপথে বহির্গত হইলেন।

নিরবসর সন্তরণের খাদ্যদ্রব্যের তালিকা :—

৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট কালে—(১) বার্লি, (২) হর্লিকস্, (৩) গ্লুকোস্, (৪) সন্দেশ, (৫) পান।

৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট কালে—(১) কফি, (২) কোকো, (৩) হর্লিকস্, (৪) দুগ্ধ, (৫) সন্দেশ, (৬) পান।

২৪ ঘণ্টা হস্তবদ্ধাবস্থা কালে—(১) গ্লুকোস্, (২) কোকো, (৩) কফি, (৪) সিঙ্গাড়া, (৫) সন্দেশ, (৬) ডাব, (৭) পান।

উপরিলিখিত খাদ্যদ্রব্য তালিকা হিসাবে এবং সাঁতারুর অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তিতরূপে খাওয়াইয়া থাকি।

## অবিরাম সন্তরণের আবশ্যকীয় দ্রব্য-তালিকা :—

(১) চর্ব্বি, (২) ভেস্‌লিন, (৩) নারিকেল তৈল বা সর্ষপ তৈল, (৪) কলোডিয়াম, (৫) রঙীন চশমা, (৬) গোলাপ জল, (৭) স্পিরিট, (৮) তুলা, (৯) পাউডার, (১০) ফিডিং কাপ্, (১১) আইস্ ব্যাগ, (১২) ষ্টোভ, (১৩) আই ড্রপ্, (১৪) পরিষ্কার কাপড়, (১৫) অয়েল ক্লথ, (১৬) বরফ, (১৭) স্মেলীং সল্ট্।

# প্রফুল্লকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইংরাজী ১৯০১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কুমারটুলির বাটিতে শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমারের জন্ম। চার বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। আর্থিক অসচ্ছলতা বশতঃ প্রফুল্লকুমার শৈশবে বিশেষ লেখাপড়া করিতে পারেন নাই। প্রফুল্লকুমার এগার বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ মহাশয়ের সার্কাসে যোগদান করেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে পিরামিড, ট্রাপিজ, অশ্বপরিচালনা ও তৎপৃষ্ঠে নানারূপ ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিয়া সার্কাসের কর্ত্তৃপক্ষকে বিমুগ্ধ করেন। সেই সময় হইতে প্রায় তিন-চার বৎসর কাল তিনি উক্ত দলের সহিত ভারতের নানাস্থানে ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে থাকেন। অশ্ব পরিচালনায় তিনি এমন পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে কর্ত্তৃপক্ষ অনেক সময়ে নূতন অশ্বের সোয়ারের জন্য উঁহাকেই মনোনীত করিতেন।

১৯১৮ সালে প্রফুল্লকুমার সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে যোগদান করেন। উঁহার সাঁতারের উন্নতির মূলে স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়েরও যথেষ্ট প্রেরণা আছে। সন্তরণ ব্যতীত অন্যান্য স্থল-ক্রীড়ায় প্রফুল্লকুমারের কৃতিত্বের পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। হাই-জ্যাম্প, পোল-জ্যাম্প, দৌড় ও হাঁটা-পাল্লা, সাইকৃল্, এমন কি মোটর পরিচালনাতেও নিজের গৌরব এতোটুকু ক্ষুণ্ণ করেন নাই। প্রফুল্লকুমার ওয়াটার-পোলোয় একজন দক্ষ খেলোয়াড় ও উচ্চ ঝম্পমঞ্চের একজন ওস্তাদ মঞ্চী। বোম্বায়ের ভিক্টোরিয়া ক্যানিঙ্গ্যালে সতর দিবসের জন্য তিনি ষাট ফিট উচ্চ ঝম্পমঞ্চ

হইতে প্রত্যহ দুইবার করিয়া বহু দর্শকের সমক্ষে অগ্নিঝম্প প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু সেই সময় প্রফুল্লকুমারের দেখাদেখি কলিকাতার আহিরীটোলা সন্তরণ সমিতির সভ্য স্বর্গীয় কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত (হাবা) কোন এক ক্যার্নিভ্যালে যোগ দিয়া এবং কতকগুলি অনভিজ্ঞ ব্যক্তির প্ররোচনায় ঐরূপ অগ্নিঝম্প করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। এই ঘটনায় চতুর্দ্দিকে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বোম্বে কোম্পানী ভারতীয়দের এই অযোগ্যতা দেখিয়া ভয়ে প্রফুল্লকুমারকেও চাকুরী হইতে ইস্তফা দিল। অবশেষে প্রফুল্লকুমার বোম্বে স্থইমিং বাথে শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত হইলেন।

## সন্তরণ-শিক্ষা

১৯১৮ সালে প্রফুল্লকুমার সেণ্ট্রাল স্থইমিং ক্লাবে ভর্ত্তি হইলেন। উঁহার শিক্ষার ভার সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ আমারই হস্তে দিলেন। আমি একখানি ছোট গামছা উঁহার কোমরে বাঁধিয়া দেশী প্রথা অনুসারে জলে

চিত্র "ছ"—বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল

নামাইয়া সাঁতার মঞ্চের সোজাসুজি বার দুই ঘুরাইলাম। অবশেষে পরীক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ছাড়িয়া দিলাম। প্রফুল্লকুমার আমার সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং সাঁতরাইয়া মঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জলের মধ্যে দেহ স্থাপন

আমি এই বিস্ময়কর ব্যাপারে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি নিশ্চয় অন্যত্র সাঁতার শিক্ষা করিয়াছেন? শিক্ষার্থী কখনই শিক্ষকের বিনা সাহায্যে এতখানি পথ সাঁতরাইয়া আসিতে পারেন না।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন—"আমি অন্যত্র সাঁতার শিখি নাই। এই আপনার নিকট হাতে খড়ি। আমি প্রত্যহ প্রত্যূষে ও বৈকালে রেলীংএর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আপনাদের শিক্ষা-কৌশল দেখিতাম এবং মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিতাম।" স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্র দত্ত মহাশয়ও প্রফুল্লকুমারের ন্যায় একদিনেই এক ঘণ্টার মধ্যে সাঁতার শিক্ষা করিয়াছিলেন।

চিত্র "জ"—চিৎ সাঁতারের দ্বারা বিশ্রাম

প্রায় তিন-চার মাস শিক্ষা দিবার পর প্রফুল্লকুমারকে কলিকাতা সুইমিং এসোসিয়েসনের বাৎসরিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় এক শত দশ গজের পাল্লায় অবতরণ করাইলাম। প্রফুল্লকুমার বড় বড় নামজাদা সাঁতারুদিগের সহিত পাল্লা দিয়া চতুর্থ স্থান কৃতিত্বের সহিত অধিকার করিলেন। আমিও উঁহাকে সারা বৎসর ধরিয়া ড্রিলের সাহায্যে শিক্ষা দিতে লাগিলাম।

১৯১৯ সালে প্রফুল্লকুমার এসোসিয়েসনে চারশত চল্লিশ গজে পুনরায় অবতরণ করিলেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থান লইয়া একটা গণ্ডগোল হইল। আমি বলিলাম যে যদি আপনি তৃতীয় স্থান অধিকার

জলের মধ্যে বিশ্রামের দেহ-ভঙ্গী

করেন তাহা হইলে আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমি তাহা করি নাই। আমি উঁহাকে আশা দিয়া বঞ্চিত করিলাম। এই ঘটনায় প্রফুল্লকুমার অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া সেই দিবস প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আগামী বৎসরে তিনি সমস্ত পুরাতন সময় নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিয়া নূতন

সময় স্থাপন করিবেন। আমি উঁহার এই সৎসাহসে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম ও পুনরায় নূতন উদ্যমে শিক্ষা দিতে লাগিলাম প্রফুল্লকুমার এই দিবস হইতে সাতারুদের লক্ষ্য না করিয়া তাহাদের সময়ের উপর লক্ষ্য করিলেন ; কি করিয়া উহাদের সময় নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিবেন এই চিন্তাই অহরহঃ করিতে লাগিলেন।

এই সময় আহিরীটোলা সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত মুরলীলাল মুখার্জ্জি (পোকা) দূর-পাল্লার, অর্থাৎ আট শত আশি গজ ও চার শত চল্লিশ গজ, সাঁতারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে চার-পাঁচ বৎসরকাল প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। উঁহাকে পরাজিত করিবার জন্য আমরা সকলেই বহু চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কোন রকমেই কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে প্রফুল্লকুমার ও যুগল্ গোস্বামীকে মুরলী বাবুকে পরাজিত করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলাম। শেষোক্ত ব্যক্তি মুরলী বাবুকে আট শত আশি গজে পরাজিত করিলেন বটে, কিন্তু সময় নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। প্রফুল্লকুমার অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। আমি উঁহার পাড়ি সামান্য পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া পুনরায় শিক্ষা দিতে লাগিলাম।

অতি অল্প দিনের মধ্যে সুফল ফলিল, কিন্তু ১৯২১ সালে কলিকাতা এসোসিয়েসনের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় আমাদের সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ উহাদের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন। আমাদের মনস্তুষ্টির জন্য স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অন্তর্সমিতির প্রথম বাৎসরিক জল-ক্রীড়া সংস্থাপন করিলেন। এই সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রফুল্লকুমার একশত দশ গজ ব্যতীত অধিকাংশ বাজীতে প্রথম স্থান কৃতিত্বের সহিত নূতন সময়-নির্দ্দেশ স্থাপন করিয়া অধিকার করিলেন। আমি অধিকাংশ বাজীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলাম বটে, কিন্তু

আমার অন্তর্দাহ হইল। মনে মনে ভাবিলাম যে, খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছি। আমি এই দিবস হইতে প্রফুল্লকুমারকে একটু হাতে রাখিতে চেষ্টা করিলাম।

চিত্র "ঝ"—হস্তবদ্ধ অবস্থায় কাঁচি-পাড়ি

১৯২১ ও ২২ সালে প্রফুল্লকুমার এসোসিয়েসনের মুক্ত প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় আমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে আমার শিক্ষায় তিনি ঈপ্সিত ফল পান নাই। আমিও বুঝিলাম যে কথাটা যুক্তিহীন নয়। সক্ষম হইয়া ছাত্রের প্রতি এইরূপ অবিচার করা কোনও খেলয়াড়ের উচিত নয়। আমি সেই দিবস হইতে উঁহাকে প্রত্যহ সঙ্গে লইয়া গঙ্গার স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটাইতে অভ্যাস করাইতে লাগিলাম। প্রত্যহ গঙ্গা পারাপার হইতাম। এমন কি দারুণ পৌষের শীতে আমরা পারাপার হইতাম। এই সময় আহিরীটোলা ও ভারতীয় জীবন-রক্ষক সমিতির সৌজন্যে তের মাইল ও বাইশ মাইল সন্তরণ

প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। আমিও নূতন সাঁতারুদের ঐ প্রতি-যোগিতায় অবতরণ করাইব লোভ দেখাইয়া প্রত্যহ গঙ্গা পারাপার ও গঙ্গা-ভীতি বিদূরিত ও দম্ করাইতে লাগিলাম।

১৯২৩ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি এইরূপ পরিশ্রম সত্ত্বেও যখন পাড়ির কোনরূপ উন্নতি হইল না, তখন উভয়ে স্থির করিলাম যে আমি দূর-পাল্লা, অর্থাৎ ১৭৬০ গজ, ৮৮০ গজ ও ৪৪০ গজের জন্য প্রস্তুত হইব এবং প্রফুল্লকুমার স্বল্প পাল্লা অর্থাৎ ২২০ গজ ও ১১০ গজের জন্য প্রস্তুত হইবেন। আমি দূর-পাল্লার জন্য মামুলি কাঁচি-লাথি-যুক্ত পাড়ি রাখিলাম এবং প্রফুল্লকুমারের মামুলি পাড়ি পরিবর্ত্তন করিয়া চার-পদী পাড়ি অর্থাৎ ৪টি করিয়া পায়ের আঘাত ও ২টি করিয়া হাত পাড়ির সহিত মিল রাখিয়া এক নূতন ধরণের দুন্-পাড়ির সৃষ্টি করিয়া উঁহাকে থামা-ঘড়ির সময়ের সহিত অভ্যাস করাইতে লাগিলাম।

এই নবাবিষ্কৃত পাড়িতে প্রফুল্লকুমার দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ পাল ( সেণ্ট্রালের ভূতপূর্ব্ব সভ্য, বর্ত্তমান ন্যাশানাল ) ও আপ্তাপ কুঠারীর ( সেণ্ট্রাল ) উপর ভার দিলাম যে উহারা যেন প্রত্যহ প্রফুল্লকুমারকে সঙ্গে লইয়া বেলা ৪ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ারে গমন করিয়া গোপনে ঘড়ির সময়ের সঙ্গে তাঁহাকে চর্চ্চা করায় এবং সেই সাঁতারের সময় নির্দ্দেশের ফলাফলের সংবাদ আমাকে দেয়। যথাকালে উহাদের নিকট হইতে পৃথক সময় সংক্ষেপ আমি আদৌ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য আমি এক দিবস স্বয়ং বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রফুল্লকুমারকে সঙ্গে লইয়া কলেজ স্কোয়ারে গিয়া ১১০ গজের সময় পাইয়া একেবারে বিস্মিত হইলাম। আমি সেই দিবস সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিলাম যে, এই বৎসর বাংলাদেশে এমন কোন সাঁতারু নাই যে সে প্রফুল্লকুমারকে সাঁতারে

পরাস্ত করিতে পারে তখন এসোসিয়েসনের প্রতিযোগিতার মাত্র পনর দিবস বাকী।

প্রফুল্লকুমারের এই আশাতিরিক্ত উন্নতি দেখিয়া এবং আমার এই নবাবিষ্কৃত পাড়ির চটক ও দ্রুততা দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া আমি উহার নকল করিয়া উভয়েই প্রত্যেক বাজীতে সেই বৎসর এসোসিয়েসনে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলাম। শুনিতে পাই এই পাড়ি বিলাতে আমাদর আবিষ্কারের বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যবহার হয়, কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রথম।
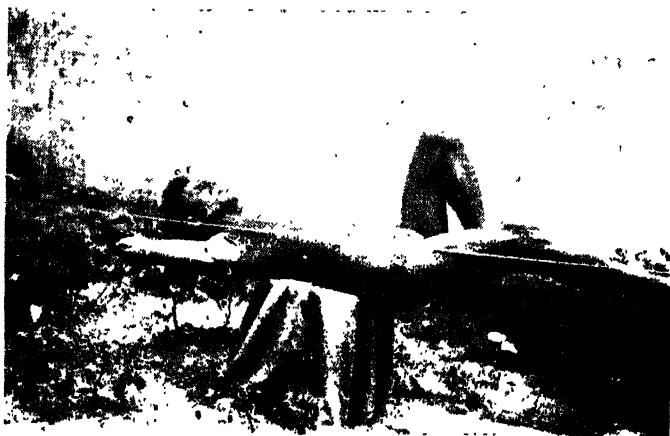
চিত্র "ঞ"—হস্তবদ্ধ অবস্থায় মস্তকের নীচে হস্ত রাখিয়া বিশ্রাম

প্রফুল্লকুমার এই বৎসর প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেক বাজীতে পুরাতন সময় নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় প্রফুল্লকুমার কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারে চাকুরী করিতেন। রাত্রি জাগরণ ও নানারূপ অনিয়মের জন্য উঁহার

সাঁতারের অনেক ক্ষতি করিয়াছে। মনে আছে ২৩ সালে খড়দহ রিষড়া "পূর্ণচন্দ্র মেমোরিয়াল কাপ্" গঙ্গাপার সাঁতারের বাজীতে তিনি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া এত দ্রুত আসিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে কর্ত্তৃপক্ষ ও বিচারকেরা বিশেষভাবে প্রফুল্লকুমারের দেহ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। উঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, মানুষ এত দ্রুত সাঁতার কাটিতে পারে না।

## অবিরাম সন্তরণের প্রণালী

দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণের জন্য অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশল-যুক্ত কোন পাড়ির আবশ্যক করে না। যে কোন তৃতীয় শ্রেণীর সাঁতারু অতি অল্প দিনের মধ্যে সামান্য অভ্যাসের দ্বারা ইহা আয়ত্ত করিতে পারে। এই অবিরাম সাঁতারের একমাত্র অবলম্বন মানসিক দৃঢ়তা ও সহনশীলতা।

হস্ত-পদবদ্ধাবস্থায় স্কালিং সাহায্যে সন্তরণ

সাধারণতঃ চব্বিশ ঘণ্টা বা আটচল্লিশ ঘণ্টা অবিরাম সন্তরণের জন্য এক ঘণ্টাকাল নিয়মিত চর্চ্চা রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রত্যহ দশ-বার ঘণ্টাকাল জলে পড়িয়া থাকা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। অধিক্ষণ

জলে থাকিলে শরীরের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে, ফলে মানসিক বল দৃঢ়তাও হারাইবে। শরীরে অবসাদ আসিলে কোন কার্য্যই ভাল লাগিবে না।

শিক্ষাকালে দৈনন্দিন আহার, বিহার ও নিদ্রার প্রতি সাঁতারুকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সাঁতার কাটিব বলিয়া অকস্মাৎ প্রাত্যহিক খাদ্যের পরিবর্ত্তন যেন না করা হয়। বাঙালী সাঁতারুর পক্ষে মাংস, ডিম, মৎস্য জাতীয় খাদ্য যতই অল্প ভক্ষণ করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। উহার পরিবর্ত্তে শাক-শব্জী, দুগ্ধ, ঘৃত, ফল-ফুলারি, মাখন, চিজ্ প্রভৃতি হজমের শক্তি অনুযায়ী গ্রহণ করা বিধেয়। প্রাত্যহিক খাদ্য এরূপ ভক্ষণ করা উচিত যাহা সহজেই হজম হয়। অবশ্য সাঁতারুর প্রাত্যহিক নিয়মিত খাদ্য যদি মাংস হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা, তবে পরিত্যাগ করিলেই ভাল হয়। এই কথা প্রত্যেক সাঁতারুর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শাক-সব্জী ও ফল-ফুলারিতে সাঁতারের দম বৃদ্ধি করে এবং শরীর স্নিগ্ধ ও কোমল রাখে। সাঁতার কাটিব বলিয়া সেই দিবস প্রচুর মাংস ভক্ষণ করিয়া শরীরের শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে,—ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ইহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই যথেষ্ট হয়।

প্রত্যেক সাঁতারু প্রত্যহ সাঁতার কাটিবার পর দৈনিক নিয়ম ও মাপ অনুযায়ী যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া অন্ততপক্ষে অর্দ্ধঘণ্টা কাল সমস্ত শরীর—মস্তকের কেশ হইতে পদদ্বয়ের নখ পর্য্যন্ত—সম্পূর্ণরূপে এলাইয়া বিশ্রাম লইবে। নিদ্রা জয় করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রাত্রি জাগরণ আবশ্যক। প্রথমে চব্বিশ ঘণ্টা হইতে ছত্রিশ, পরে আটচল্লিশ এইরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে। সাঁতারের সময় পূর্ব্বকথিত তালিকাভুক্ত নির্দ্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয় সাঁতারুকে দিতে হইবে। কোনক্রমেই গুরুপাক খাদ্য তাহাকে যেন না দেওয়া হয়। যদি সাঁতারুর বমন ইচ্ছা বা অম্লজনিত

কোনরূপ পেটের গোলমাল থাকে বা চুঁয়া ঢেকুর ওঠে, তৎক্ষণাৎ গুঁড়া সোডার সহিত সামান্য জল মিশ্রিত করিয়া কয়েক ফোঁটা পাতি নেবুর রস দিয়া পান করাইবে। বিনা কারণে কতকগুলি উগ্র ঔষধ পান করাইবে না। সাঁতারু যেন সর্ব্বদাই তাহার স্বভাবের সহিত মিল রাখিয়া কার্য্য করে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইন্‌জেকৃশ্যান বা অন্য কোন প্রকারে বিষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নির্য্যাতন করা কোনক্রমে যুক্তিযুক্ত নহে—অবশ্য সর্ব্বদাই ডাক্তার মোতায়ন রাখিবে।

ডাক্তারের কার্য্য কেবলমাত্র নাড়ী ও হৃদ্‌যন্ত্রের গতি পরীক্ষা করা। যদি সাঁতারুর চক্ষু জ্বালা করে বা পীড়িত হয়, তৎক্ষণাৎ ড্রপারের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে লোশন বা গোলাপ জল ব্যবহার করিবে এবং রঙীন চশমা পরাইয়া দিবে। রৌদ্রের সময় সর্ব্বদাই রঙীন চশমা ব্যবহার করিবে।

জলে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে সাঁতারুকে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া পরে খুব সাবধানতার সহিত পদদ্বয়ের নখ হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত, আবহাওয়ার অবস্থা বুঝিয়া সরু মোটা করিয়া চর্ব্বি মাখাইবে। এই চর্ব্বি সর্ষপ তৈলের সংমিশ্রণে ফেনাইয়া আঠাযুক্ত করিয়া নরম করিয়া লইবে। বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যে, এই চর্ব্বি যেন কোনমতে মস্তকে বা মুখে না লাগে। হস্তের বা পদের তলদেশে সাদা ভেস্‌লিন ব্যবহার আবশ্যক। সাঁতারুকে কস্‌টিউমের পরিবর্ত্তে ঢিলা নরম রবার সংযুক্ত ছোট পায়জামা ব্যবহার করিতে দিবে। শরীর ও মস্তক সর্ব্বদাই অনাবৃত রাখিবে।

অধিকক্ষণ সাঁতারের পর সাঁতারু যদি মাথায় যন্ত্রণা অনুভব করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বরফপূর্ণ থলি সাঁতারুর স্কন্ধে, ব্রহ্মতালুতে, মুখে এবং চক্ষে অবস্থা বুঝিয়া অন্ততপক্ষে পাঁচ হইতে দশ মিনিট কাল লাগাইবে এবং

শ্রীনলীন মল্লিক

শ্রীদুর্গাদাস

শ্রীরাজারাম সাহু

সে যাহাতে ঘন-ঘন জলের মধ্যে মস্তক রাখিয়া সাঁতার কাটিতে পারে সেইরূপে উপদেশ দিবে। সাঁতারু যেন সর্ব্বদাই পুষ্করিণীর ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে। এই সমস্ত কার্য্যের ভার জীবন-রক্ষকদিগের ; তাঁহারাই সর্ব্বদা সাঁতারুর নিকট থাকিয়া উপদেশ দিবেন। অবিরাম সাঁতারেব সাফল্য অনেকটা জীবন-রক্ষক সঙ্গীদের বিবেচনা ও কর্ম্মতৎপরতার উপর নির্ভর করে।

নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য আতসবাজী, কর্কশ শব্দযুক্ত যন্ত্র, খোস গল্প ও উজ্জ্বল আলোকের বন্দোবস্ত রাখা আবশ্যক। সাঁতারুর মেজাজ বুঝিয়া এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার ভাল। রৌদ্রের তাপ হইতে সাঁতারুকে রক্ষা করিবার জন্যই পুষ্করিণীর একাংশে চাঁদোয়া খাটাইবার ব্যবস্থা রাখা একান্ত আবশ্যক। যদি অসুবিধা থাকে তাহা হইলে এই ভার জীবন-রক্ষকদিগকে লওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা রৌদ্রের সময় ছাতা দিয়া সাঁতারুর পাশে পাশে সাঁতরাইয়া তাপ হইতে সাঁতারুকে রক্ষা করিবেন। জীবন-রক্ষকদিগকে অবশ্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে যেন কোন ক্রমেই সাঁতারুর অঙ্গ স্পর্শ না হয়।

## অবিরাম সন্তরণ-শিক্ষা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই অবিরাম সন্তরণ কে কোন তৃতীয় শ্রেণীর সাঁতারু কাটিতে পারে। উপুড় হইয়া দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদের এবং বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া "ছ" চিত্রের ন্যায়, শরীরের নিম্ন অংশ জলের মধ্যে ৪৫° ডিগ্রি নামাইয়া, সাঁতারুর সুবিধা অনুযায়ী এবং সমস্ত শরীরকে সম্পূর্ণরূপে এলাইয়া দিয়া শিথিল ভাবে ধীরে ধীরে সাঁতার দিবে। মধ্যে মধ্যে দশ-পনর সেকেণ্ডের জন্য মস্তক ডুবাইয়া রাখিবে। শরীরের উষ্ণতা সমভাবে রাখিতে হইবে।

কিছুক্ষণ সাঁতার কাটিবার পর যদি শরীরে কষ্ট অনুভূত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ চিৎ হইয়া "জ" চিত্রের ন্যায় সামান্য শিথিলরূপে হস্ত সঞ্চালন করিয়া এবং সাইকেল চালানোর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে পা চালাইয়া থাকিতে হইবে। নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েক ঘণ্টা কাটাইবার পর পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ধরণে সাঁতার কাটিবে। সাঁতারের একঘেয়েমি কাটাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে দুই-চার মিনিটের জন্য একহাতি পাড়ি অর্থাৎ সাইড-ষ্ট্রোকেরও সাহায্য লইতে পারা যায়। এইরূপ থাকিবার নিয়মগুলি সাঁতারের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে নিয়মিত অভ্যাস করিয়া লওয়া উচিত। হঠাৎ সাঁতারের কায়দা পরিবর্ত্তন করিলে ক্ষতি হইতে পারে।

সাঁতারের প্রথম কয়েক ঘণ্টা সামান্য কষ্ট হইবে। সেই কষ্ট কোন রকমে সহ্য করিতে পারিলেই সাঁতার ক্রমশঃই সহজ হইয়া আসিবে। রাত্রি দশটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত এবং প্রত্যূষে চারটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত সাঁতারুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। মধ্যাহ্নে বারটা হইতে তিনটার মধ্যে আর একটা টাল আসে। এই সময় জীবন-রক্ষীদলকে সঙ্গে থাকিয়া নানাপ্রকার খোস গল্প ইত্যাদি করিয়া সাঁতারুকে ভুলাইয়া রাখিতে হইবে।

## জীবন-রক্ষকদিগের কার্য্য

১। সন্তরণকালে সাঁতারু যদি আবহাওয়া বশতঃ অত্যন্ত শীত অনুভব করে এবং কাঁপিতে থাকে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পানীয়ের মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দিবে; অর্থাৎ যে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর সাঁতারুকে পানীয় দেওয়া হইতেছিল সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্তত পক্ষে

দুইবার পানীয় দিবে, এবং কিয়ৎক্ষণের জন্য সাঁতারুকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে উপদেশ দিবে। পানীয়ের মাত্রা খুব সামান্য হইবে।

২। শরীরের কোন অংশে খাল ধরিলে জীবন-রক্ষক তৎক্ষণাৎ জলে অবতরণ করিয়া সেই পীড়িত অংশ খুব সাবধানতার সহিত মর্দ্দন করিয়া দিবে।

৩। শরীরে চর্ব্বি না থাকিলে চর্ব্বি মাখাইয়া দিবে। রৌদ্রের সময় প্রচুর চর্ব্বি মাখাইবে না। এই চর্ব্বি রৌদ্রের তাপে গলিয়া গিয়া সাঁতারুর দেহ জ্বালাইয়া দিবে। দেহে প্রচুর চর্ব্বি লাগাইয়া লোমকূপ বন্ধ করিবে না। আমাদের গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে ঘন চর্ব্বি মাখানর কোন আবশ্যকতা নাই। এই ভার পাকা জীবন-রক্ষকের লওয়া উচিত। সর্ব্বদাই আবহাওয়ার ও জলের তাপ ও শৈত্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়।

৪। অধিকক্ষণ জলে থাকিবার জন্য হস্ত ও পদের তলদেশ ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ স্থলে সামান্য মাত্র কলোডিয়াম ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু এই কার্য্যের ভার স্থানীয় ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে হইবে।

৫। চক্ষে চর্ব্বি বা তৈল লাগিলে লিকুইড্ প্যারাফাইন ব্যবহার করিবে। পরিষ্কার কাপড় বা তুলা দিয়া চোখ মুছিয়া দিবে। পুনরায় ওই কাপড় বা তুলা ব্যবহার করিবে না।

৬। নিদ্রার বেগ আসিলে কফি কিম্বা কোকো দিবে। অন্যান্য সময় সাঁতারুর পছন্দ অনুযায়ী তালিকা অন্তর্গত দ্রব্যগুলি দিবে। কোন অবস্থায় গুরুপাক বা কঠিন খাদ্য দিবে না।

৭। সাঁতারুকে জল হইতে ষ্ট্রেচারে তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে একখানি

মোটা কম্বলের দ্বারা পদদ্বয় হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী কোন আলো-বাতাসযুক্ত গৃহে লইয়া যাইবে। তাহার পরিধেয় বস্ত্র উন্মোচন করিয়া স্পিরিটসিক্ত তুলা দিয়া সতর্কতার সহিত গাত্রের চর্ব্বি উঠাইয়া অবশেষে সমস্ত দেহে পাউডার দিয়া অয়েল-ক্লথযুক্ত শয্যায় শয়ন করাইয়া পুনরায় কম্বলাবৃত করিয়া মস্তকে কিয়ৎক্ষণের জন্য বাতাস দিবে। যদি সাঁতারু জাগ্রত থাকে তাহা হইলে তাহাকে অল্প অল্প করিয়া গরম দুগ্ধ পান করিতে দিবে। সাঁতারু যদি নিদ্রা যায় তাহাকে কোনরূপ বিরক্ত করিবে না। সাঁতারুর গৃহে দুই-একজন লোক সর্ব্বদাই মোতায়ন থাকিবে। নিদ্রা হইতে উঠিলে পুনরায় দুগ্ধ, মোহনভোগ ইত্যাদি খাদ্য দিবে।

## হস্তবদ্ধ সন্তরণ

হাতকড়া বদ্ধাবস্থায় দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণ পূর্ব্বের চিত্র দুটির নিয়মের দ্বারায় কাটিলেই অধিকক্ষণ জলে থাকা সম্ভবপর হইবে। "ঝ" চিত্রের ন্যায় পার্শ্বে হেলিয়া দুই হস্তে কাঁচি পদের সহিত মিল্ রাখিয়া একত্রে টানিয়া সাঁতরাইবে। একঘেয়েমি এবং একদিকের অঙ্গের পেষণ দূর করিবার জন্য কখন দক্ষিণ, কখন বা বামপার্শ্বে ফিরিয়া সাঁতার কাটিবে। বিশ্রামের জন্য "ঞ" চিত্রের ন্যায় চিৎ হইয়া মস্তকের তলদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া অর্থাৎ হস্তের উপর মস্তকের সম্পূর্ণ ভার রাখিয়া পূর্ব্ব কথিত সাইকেল চালনার ন্যায় অতি ধীরে পদদ্বয় সঞ্চালন করিবে। এইরূপে অবিরাম সাতারের আইনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চলা শ্রেয়স্কর। এই দুই নিয়মে প্রত্যহ অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল অভ্যাস করিয়া পরে দীর্ঘকালের জন্য অবতরণ করিবে।

## হস্ত-পদ বদ্ধাবস্থায় সন্তরণ

হস্ত-পদ বদ্ধাবস্থায় সাঁতারে যথেষ্ট ধৈর্য্যের আবশ্যক। প্রথমতঃ সাঁতারুকে দীর্ঘকালের জন্য জলের উপর অবলীলাক্রমে ভাসা আয়ত্ত করিতে হইবে। এই অভ্যাসের পর হস্তপদ বদ্ধ করিয়া স্কালিংএর সাহায্যে অর্থাৎ লম্বা চিৎ হইয়া সমস্ত শরীর জলের উপর কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভাসাইয়া মস্তকের পশ্চাতে হস্ত রাখিয়া "ট" চিত্রের ন্যায় কেবল মাত্র দুই হস্তের কব্জী ঘুরাইয়া হস্তের তালুর দ্বারায় পদদ্বয়ের দিক দিয়া সাতার দিবে। এই সাঁতার দীর্ঘকাল কাটিতে হইলে সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অর্দ্ধেক সময় অভ্যাস করিতে পারিলেই ভাল হয়। একঘেয়েমি কাটাইবার জন্য কখন কখন উপুড় হইয়া কিছুক্ষণের জন্য থাকিতে পারা যায়—অবশ্য সে সাঁতারুর শিক্ষা বা নিজের ক্ষমতার উপর কতকটা নির্ভর করে। হস্ত-পদ বদ্ধাবস্থায় সন্তরণের সময় সর্ব্বদাই একজন করিয়া জীবন-রক্ষী সাঁতারুর পার্শ্বে থাকিবে।

## কলিকাতায় অবিরাম সন্তরণের বিবরণ

এতাবৎকাল কলিকাতা সহরে যতগুলি নিরবসর সন্তরণ হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ পাল, মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী (সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব সভ্য, বর্ত্তমান ন্যাশানাল), শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস (কলেজ স্কোয়ার), সুকুমার ভড়ের (সেণ্ট্রাল) নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই অবিরাম সন্তরণে দোহাতি-পাড়ির প্রচলন সর্ব্বপ্রথম প্রফুল্লকুমার প্রদর্শন করিয়াছেন। উহার দেখাদেখি বীরেন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে ৩২ ঘণ্টাব্যাপী সন্তরণকালে প্রত্যুষে ৬ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিরাম দোহাতি-পাড়ি ব্যবহার করিয়া সমস্ত দর্শক-

বৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পর, সন্তরণের শেষ পর্য্যন্ত একহাতি পাড়ি অর্থাৎ পার্শ্বে শুইয়া ১ হাত জলের মধ্যে ও অপর হাত জলের উপরে টানিয়া ৩২ ঘণ্টাকাল সম্পূর্ণ করিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী ২৯ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত একহাতি-পাড়ি ব্যবহার করিয়াছিল।

আজকাল অবিরাম সন্তরণকারীরা এ-ধরণের সাঁতার কাটিতে আদৌ সাহস করে না। কোন রকমে সামান্য মাত্র নড়িয়া ও সাঁতারের আইন বাঁচাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় কাটাইতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করে।

মনে পড়ে ১৯৩০ সালে হেদুয়ার পুষ্করিণীতে ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট অবিরাম সন্তরণের সময় স্যার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং চৈনিক কন্সল্ জেনার্ল্ প্রফুল্লকুমারের পাড়ির দ্রুততা দেখিবার ইচ্ছা করেন। প্রফুল্ল-কুমার তৎক্ষণাৎ কলিকাতার বিখ্যাত সাঁতারুদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আহ্বান করিয়া পুষ্করিণীর দুই পাকে অর্থাৎ ৩৪০ গজ সাঁতারের পাল্লায় সকলকেই পরাস্ত করেন। এই অলৌকিক ব্যাপারে সমস্ত দর্শকবৃন্দ একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তখন মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পূর্ণ হইয়াছিল।

১৯৩৩ সালে রেঙ্গুন রয়েল লেকে ৫০ ঘণ্টা সাঁতারের পর ৫০ গজের পাল্লায় মিঃ আগান্নুর নামে একজন বর্ম্মার খ্যাতনামা সাঁতারুকে নির্ম্মম-ভাবে প্রফুল্লকুমার পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ শক্তি ও সন্তরণের কৌশল দর্শনে লক্ষ লক্ষ দর্শক একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৯২৯ সালে হায়দ্রাবাদ নিবাসী মহম্মদ সফি ওয়েলেস্লি পুষ্করিণীতে ২৪ ঘণ্টাকাল ও এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ছাত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চাটার্জ্জী ৫৪ ঘণ্টাকাল সাঁতারের মধ্যে কোন কৃতিত্ব দেখি নাই। উঁহারা অধিকাংশ সময়ই জলের উপর হস্ত ও পদ এলাইয়া দিয়া কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভাসমান ছিলেন।

১৯৩৩ সালে ভবানীপুর পদ্মপুকুরে মালাবার নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামীর ৫৩ ঘণ্টা অবিরাম সন্তরণও বিশেষ সন্তোষজনক নহে। তিনি অধিকাংশ সময়ই সাঁতার-মঞ্চের সম্মুখে বক্ষপ্রমাণ জলে সর্ব্বদাই তিন-চার জন জীবন-রক্ষকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সাঁতার দিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণের পথপ্রদর্শক আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় অগ্নিকুমার সেন। তিনি বাগবাজার সন্তরণ সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯২৭ সালে ৫০ বৎসর বয়সে কলেজ স্কোয়ারে ১৪ ঘণ্টাকাল অবিরাম সাঁতার দিয়া আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অগ্নিবাবু একজন নিম্ন-মঞ্চের বুক-ঝাঁপে দক্ষ সাঁতারু ছিলেন। তিনি বহুবার এসোসিয়েশনের ঐ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে ৩০ ও ২৩ মাইল প্রতিযোগিতায় তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। সারা পথ চিৎ সাঁতারে আসিয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালে কলেজ স্কোয়ার ক্লাবের সন্তরণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস মহাশয় এক অভিনব কৌশলের দ্বারা সন্তরণ প্রদর্শন করিয়া আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি প্রফুল্লকুমারের হাতকড়া বদ্ধাবস্থার সন্তরণের অব্যহিত পরে হস্ত ও পদ লৌহ-শৃঙ্খলের দ্বারা বদ্ধ করিয়া ৩৩ ঘণ্টাকাল চিৎ হইয়া ভাসিয়া স্কালিংএর সাহায্যে সাঁতার দিয়া সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

# মেয়েদের সাঁতার

আজকাল নারী-প্রগতির যুগ আসিয়াছে। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে প্রত্যেক স্বাধীন সভ্য দেশের নারীগণ কি রাজ-নৈতিক, কি সামাজিক, এমন কি ব্যায়ামক্ষেত্রেও তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত সমান ভাবে পাল্লা দিয়া চলিয়াছেন; আর সে পাল্লার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহারা নিজের শক্তি বা ক্ষমতার দ্বারা অর্জ্জন করিতেছেন। আমরা তার জন্য এতোটুকুও দাবী করিতে পারি না। আমরা কেবল মাত্র পারি বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বড় বড় কথা বলিতে, আর পারি নারীদিগকে নির্য্যাতন ও "অবলা" আখ্যা দিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধিকার ও বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত করিতে।

আমি "বিচিত্রায়" আমার সাঁতার শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে বলিয়াছিলাম—"কলিকাতায় মহিলাদিগের সাঁতার দিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। করপোরেশনের অধিকারভুক্ত অধিকাংশ পুষ্করিণী পুরুষেরা দখল করিয়া বসিয়াছে। জনসাধারণের কর্ত্তব্য, দুইটী 'বাথ'—একটি উত্তর কলিকাতা এবং অপরটি দক্ষিণ কলিকাতায়—কেবলমাত্র মহিলাদিগের জন্যই নির্ম্মাণ করা। দেশের সম্ভ্রান্ত এবং ধনবান ব্যক্তিরা যদি সামান্য একটু চেষ্টা করেন তাহা হইলে উপরোক্ত 'বাথ' নির্ম্মাণ করা অনায়াসে সম্ভবপর হয়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ইহাতে কলিকাতার কোন সন্তরণ-সমিতির কোন সভ্য অনেক বড় বড় কথা বলিয়া বসিলেন! "কেন, আমরা তো মহিলাদিগের জন্য

সাঁতারের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছি”—ইত্যাদি। তাঁহারা বুঝিলেন না যে এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় সমস্ত মহিলা সাঁতারুর

বাণী ঘোষ

সাঁতারের অভাব দূর করিতে পারে না। কিন্তু এই ঘটনার তিন-চার মাস পর্য্যন্ত উক্ত সমিতির কোন সজীব কার্য্য-তৎপরতা দেখি নাই, বরং

দেখিয়াছি সেই সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মহিলাদিগের স্বপ্রতিষ্ঠিত সন্তরণ সমিতির সভ্যাদের মনোমালিন্য। এই মনোমালিন্যের ফলে মহিলা-সমিতি তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকৃত সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা হারাইয়া ফেলিলেন। অনন্যোপায় হইয়া মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা ও কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যা মিলিয়া, নূতন উদ্যম লইয়া করপোরেশনের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে পৃথক সন্তরণ করিবার অনুমতি লইয়া, হেদুয়া পুষ্করিণীতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করিলেন। আজ এই নব-প্রতিষ্ঠিত মহিলা-সন্তরণ-সমিতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তাঁহাদের এই নব-প্রতিষ্ঠিত সমিতিতে বহু ভদ্রমহিলা উপেক্ষিত জলক্রীড়ার সাহায্যে তাঁহাদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। আমি এই সমিতির সাফল্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

শুনিতে পাই সমিতির সম্পাদিকা মহাশয়া তাঁহাদের পৃথক তাঁবুর জন্য করপোরেশনের কয়েকজন কাউন্সিলারের নিকট বহু আবেদন নিবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। যাহাতে মহিলাদিগের এই সাধু প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় সে বিষয়ে করপোরেশনের লক্ষ্য রাখা বা উৎসাহিত করা উচিত। আজ-কাল সাঁতার যেরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে তাহাতে মনে হয়, করপোরেশনের উচিত যে তাঁহাদের অধিকারভুক্ত প্রত্যেক উদ্যানস্থিত পুষ্করিণীতে মহিলাদিগের জন্য সাঁতারের সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া এবং যাহাতে ঐ সকল শিশু-প্রতিষ্ঠান জীবিত থাকে ও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হয় তাহারও উপায় নির্দ্ধারণ করা।

আমরা আজ-কাল কথায় কথায় নিজেকে "স্পোর্টস্‌ম্যান" বলিয়া থাকি, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে "স্পোর্টস্‌ম্যান" হইয়া পূর্ব্বোক্ত কথাটার মর্য্যাদা কি যথার্থ রক্ষা করি? যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত করে সেইখানেই

ঐ কথাটি পরিষ্কার ভুলিয়া যাই এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উচ্চতা দূর হইয়া যায় ; পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ণতা ও নীচতা প্রকট হইয়া উঠে। বাস্তবিকই যদি আমাদের মধ্যে এতটুকু খেলোয়াড়-জনিত মনোভাব থাকিত—এমন কি, আমাদের সমিতির মধ্যে দুই-একজনেরও যদি তাহা দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে উঁহাদিগকে সাদরে শ্রদ্ধানত মস্তকে আমাদিগের মধ্যে টানিয়া লইয়া বুঝাইয়া দিতাম যে এই উপেক্ষিত স্বাস্থ্যপূর্ণ জল-ক্রীড়া—যাহা মহিলাদিগের একমাত্র ব্যায়াম এবং যাহাতে স্ত্রীদেহের কমনীয়তা, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য নষ্ট হয় না—কখনই যেন পরিত্যাগ না করেন এবং আরও বুঝাইয়া দিতাম বৈজ্ঞানিক কৌশলযুক্ত সাঁতারের প্রণালী। আমি "বিচিত্রায়" আমার "সাঁতার" শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে আমাদের দেশের সাঁতারের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মূল কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি, এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা করি না।

সাঁতার আমাদের পৈতৃক এবং জাতিগত বিদ্যা। আমাদের দেশে সাঁতার শিক্ষা করিতে বিশেষ কিছু অর্থ ব্যয় হয় না। বাংলাদেশে জলের অভাব নাই। চতুর্দ্দিক খাল, বিল, নদী পুষ্করিণীতে পরিপূর্ণ। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থান আছে যেখানে জলের আধিক্য এত বেশী যে বর্ষার সময় নৌকা ব্যতীত একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই নৌকাযোগে, ভেলা কিম্বা ডোঙ্গার সাহায্যে এক গ্রাম হইতে—কখন কখন এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে যাতায়াত করিতে হয়। এইরূপ গমনকালে বহুস্থানে বহুলোক নৌকাডুবি হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের মহিলারা অনেকেই অল্প-বিস্তর সাঁতার কাটিতে পারেন, কিন্তু—তাঁহারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলযুক্ত সাঁতারের কোনও ধার ধারেন না বা চর্চ্চা করেন না। তাঁহাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই মামুলি সাঁতারের সাহায্যে

নদীর মধ্যে ঝড়-তুফানে পড়িয়া প্রাণ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন।

১। মহিলা সাঁতারুবৃন্দের প্রতি আমার একটি উপদেশ, তাঁহারা যেন উপুড়-সাঁতার অপেক্ষা চিৎ-সাঁতারেরে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। কারণ চিৎ-সাঁতারের কৌশলের দ্বারা নিয়মিত অভ্যাস না থাকিলেও বিপদ কালে অনেকদূর পর্য্যন্ত সহজেই যাইতে পারা যায় এবং নিমজ্জিত ব্যক্তিকেও ওই কৌশলের দ্বারা অতি সহজেই জল হইতে ডাঙায় বহন করিয়া আনিবার সুবিধা হয়। সাঁতারের উদ্দেশ্য কেবল বাজী জেতা নয়। ইহার উপকারিতা এবং আবশ্যকতাও যথেষ্ট আছে।

২। নদীর মধ্যে নৌকাডুবি হইলে প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে হইবে, কোন তীর নিকটবর্ত্তী। যাঁহারা অল্প সাঁতার জানেন তাঁহারা প্রথম তীর লক্ষ্য করিয়া চিৎ হইয়া সাইকেল পরিচালনার ন্যায় একটির পর একটি পা চালাইয়া এবং সামান্য হস্তের ভর রাখিয়া যাহাতে দেহ ডুবিয়া না যায়—ধীরে ধীরে স্রোতের অনুকূলে দেহ ভাসাইয়া চলিবেন। ঝড় বা তুফান উঠিলে উপুড় সাঁতারে তুফানের সহিত প্রতি পাড়িতে মুখ ডুবাইয়া চলিবেন। আমি একটি মহিলাকে ঝড়-তুফানের মধ্যে নৌকাডুবি হইয়া উপরোক্ত উপায়ের দ্বারা নদীর মধ্যপথ হইতে ডাঙায় উঠিতে শুনিয়াছি। একদিবস বর্ষায় কলিকাতার গঙ্গা পারাপারের সময় ঝড়-তুফানের সহিত লড়াই করিতে করিতে হঠাৎ আমার দুই হস্তে খিল ধরিল। আমি একেলা পার হইতেছিলাম। কোনও সঙ্গী না থাকায় আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম। মনে হইল আমি এই মুহূর্ত্তেই ডুবিয়া যাইব। নিরুপায় হইয়া চিৎ হইয়া উপরোক্ত নিয়মে স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া যাইবার পর কিনারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এরূপ ক্ষেত্রে মানসিক দৃঢ়তাই একমাত্র অবলম্বন।

কুমারী মানু ব্যানার্জী

এই নদীমাতৃক বাংলাদেশে সকলেরই সন্তরণ শিক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। এইরূপ স্বাস্থ্যপূর্ণ বিমল আনন্দদায়ক ক্রীড়া কখনই কোনক্রমেই উপেক্ষা করা উচিত নয়।

কুমারী সাবিত্রী দেবী

এ দেশের মহিলাবৃন্দের যে সাঁতারের প্রতি একটা শ্রদ্ধা আছে, তাহার পরিচয় শ্রীমান্ প্রফুল্ল ঘোষের ঢাকায় ৫৭ ঘণ্টা কাল হাত-বাঁধা অবস্থায় সন্তরণ হইতেই যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। ঢাকার ছাত্রীবৃন্দ এই বিশ্ববিশ্রুত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তরণ বীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে

এতোটুকু কার্পণ্য করেন নাই, তাহা তাঁহাদের মান-পত্র হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পাঠক-পাঠিকাদিগের জন্য মান-পত্রখানি এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মান-পত্র :—

হে বীর,

শক্তির বরপুত্র তুমি, তোমাকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি। জানি না কোন্ শুভ-মুহূর্ত্তে বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়া এই ধরায় আগমন করিয়াছ। তুমি আজ যে অসাধ্য সাধন করিয়াছ তাহাতে কেবল তোমার মাতৃভূমি নয়, সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়-পুলক দৃষ্টিতে অপলক নেত্রে তোমার দিকে চাহিয়া আছে।

হে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তোমাকে আমরা আহ্বান করিতেছি।

হে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত সাধক, তুমি তোমার দেহের শক্তি, মনের ঐকান্তিকতা, অসীম ধৈর্য্যের দ্বারা বঙ্গমাতার বহুদিনের সঞ্চিত কালিমা দূর করিয়াছ। তুমি মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, লুপ্ত শক্তি প্রবুদ্ধ করিয়াছ, তমিস্র সুপ্তির তিমিরকে শক্তির কৃপাণে বিদীর্ণ করিয়াছ। হে ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, তোমাকে আমরা অভ্যর্থনা জানাইতেছি।

হে তেজস্বী তাপস, তুমি শক্তিহীন, কর্ম্ম-কুণ্ঠ ভীরু, গৃহ-প্রিয় বাঙালী জাতির অপযশ দূর করিয়াছ। বাংলা আজ তোমার মত কৃতী সন্তানের জননী হইয়া অন্যান্য দেশের সহিত সম্মানিত আসনের দাবী করিতে পারে। হে তরুণ তাপস, তোমাকে আমরা নমস্কার করিতেছি।

হে শক্তি-পূজারী, তোমার সাধনা সিদ্ধ হউক, তোমার অভয় যশ অধিকতর সংবর্দ্ধিত হইয়া ত্রিভুবন ধ্বনিত করিয়া তুলুক। হে আমাদের বীর ভ্রাতা, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হউক—মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ সম তুমি চিরঞ্জীব হও, এই প্রার্থনা।

হে বীরকুলর্ষভ আর্য্য-প্রতিভু, দেবতার অযাচিত আশীষের ন্যায় তোমাকে পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। তোমাকে অভিনন্দন জানাইবার যোগ্য ভাষা ও উপযুক্ত প্রকাশ-শক্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না। শুধু অন্তরের ভক্তি ও সত্যকার কৃতজ্ঞতা লইয়া তোমার সম্মুখে ভীরু পদক্ষেপে উপস্থিত হইয়াছি।

হে বলী, আমাদের অন্তরের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও বিনীত নমস্কার গ্রহণ করিয়া আমাদের সামান্য আয়োজনকে সার্থক কর এবং আমাদিগকে ধন্য কর। ইতি—

১০ই আগষ্ট, ১৯১৪

কামারুন্নেছা কলেজের ও স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ

কুমারী সাঁতারুদিগের মধ্যে মহীশূর নিবাসিনী বাইরামার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪ সালে বাইরামা প্রথমে বার ঘণ্টা সাঁতার দেয়। সেণ্ট্রাল সুইমিং-এর সভ্যা কুমারী সাবিত্রী দেবী উক্ত সময়-রেকর্ড ভাঙিয়া দেয়। এই ঘটনার কয়েক দিবসের মধ্যেই বাইরামা পুনরায় আঠার ঘণ্টা সাতার দিয়া সময়ের নূতন রেকর্ড স্থাপন করে। ইহাদের উভয়ের বয়স দশ ও আট বৎসর মাত্র।

কুমারী সাবিত্রী দেবী কলিকাতায় গঙ্গাবক্ষের প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের সহিত সাঁতার কাটিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে।

কুমারী বাণী ঘোষ মেয়েদের সাঁতার প্রতিযোগিতায় বহুবার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। গত বৎসর বুক-সাঁতারে এবং গঙ্গাবক্ষে এক মাইলে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়াছে। ইহা ছাড়া লাঠি, ছুরী ও অন্যান্য স্থল-ক্রীড়ায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

কুমারী মানু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ ঘণ্টা অবিরাম সাঁতার কাটিয়া দর্শক-বৃন্দকে বিস্মিত করিয়াছে। কুমারীর বয়স মাত্র সাড়ে পাঁচ বৎসর। অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের মধ্যে মানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

## সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত সন্তরণ-বীরদের তালিকা

### কলিকাতা সুইমিং এসোসিয়েশন

### এক মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯২২ | এম্, এম্, দে (ছোট) | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ২৮মিঃ ৩০সেঃ |
| ১৯২৩ | পি, কে, ঘোষ | সেণ্ট্রাল | ২৫মিঃ ৪৮সেঃ |
| ১৯২৪ | ডি, মুল্‌জী | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ২৬মিঃ ২৯$\frac{1}{5}$সেঃ |
| ১৯২৫ | ঐ | ঐ | ২৫মিঃ ৫২$\frac{1}{5}$সেঃ |
| ১৯২৬ | ঐ | ঐ | ২৬মিঃ ১৭$\frac{1}{5}$সেঃ |
| ১৯২৭ | ঐ | ঐ | ২৬মিঃ ৪সেঃ |
| ১৯২৮ | এন্, সি, মালিক | শ্মশানেশ্বর স্পোর্টিং | ২৫মিঃ ৪৩$\frac{1}{5}$সেঃ |
| ১৯২৯ | ঐ | ঐ | ২৬মিঃ ৮$\frac{1}{5}$সেঃ |

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯৩০ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩১ | ঐ | | |
| ১৯৩২ | জে, দাস | হাটখোলা | ২৭মিঃ ৪৫$\frac{৩}{৫}$সেঃ |
| ১৯৩৩ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩৪ | দুর্গাদাস | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ২৪মিঃ ৮$\frac{৪}{৫}$সেঃ |

সাধারণের জন্য কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের সন্তরণ প্রতিযোগিতায়—

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯৩৪ | দুর্গাদাস | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ২৪মিঃ ৭$\frac{১}{৫}$সেঃ |

## অর্দ্ধ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯১৫ | এম্, এল্, মুখার্জ্জী | আহিরীটোলা | ১৪মিঃ ১৯সেঃ |
| ১৯১৬ | ঐ | ঐ | ১৩মিঃ ৩০সেঃ |
| ১৯১৭ | ঐ | ঐ | ১৩মিঃ ২৩$\frac{১}{৫}$সেঃ |
| ১৯১৮ | ঐ | ঐ | ১২মিঃ ৪৩সেঃ |
| ১৯১৯ | ঐ | ঐ | ১৪মিঃ ১০সেঃ |
| ১৯২০ | জে, কে, গোস্বামী | সেণ্ট্রাল | ১৩মিঃ ৩৮$\frac{৩}{৫}$সেঃ |
| ১৯২১ | এম্, এল্, মুখার্জ্জী | আহিরীটোলা | ১৪মিঃ ৫০$\frac{১}{৫}$সেঃ |
| ১৯২২ | এম্, এম্, দে (ছোট) | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ১৩মিঃ ২১$\frac{২}{৫}$সেঃ |
| ১৯২৩ | পি, কে, ঘোষ | সেণ্ট্রাল | ১২মিঃ ২৯$\frac{৪}{৫}$সেঃ |
| ১৯২৪ | ডি, মুল্‌জী | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ১২মিঃ ৪১$\frac{১}{৫}$সেঃ |
| ১৯২৫ | ঐ | ঐ | ১২মিঃ ৩৫$\frac{১}{৫}$সেঃ |
| ১৯২৬ | ঐ | ঐ | ১২মিঃ ৩৩$\frac{২}{৫}$সেঃ |
| ১৯২৭ | ঐ | ঐ | ১২মিঃ ৪৬$\frac{২}{৫}$সেঃ |
| ১৯২৮ | এন্, সি, মালিক | শ্মশানেশ্বর স্পোর্টিং | ১২মিঃ ২৪সেঃ |
| ১৯২৯ | ঐ | ঐ | ১২মিঃ ৯সেঃ |

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯৩০ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩১ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩২ | এ, কে, চক্রবর্ত্তী | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ১৩মিঃ ২৪সেঃ |
| ১৯৩৩ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩৪ | দুর্গাদাস | ঐ | ১১মিঃ ৪০ ৪/৫সে |

সাধারণের জন্য কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের সন্তরণ প্রতিযোগিতায়—

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯৩৪ | দুর্গাদাস | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ১১মিঃ ৪০ ২/৫সেঃ |

## ৪৪০ গজ সন্তরণ প্রতিযোগিতা

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯১৩ | এফ, আর, ভ্যান্ ডাইক্ | ক্যাল্‌কাটা ক্লাব | ৭মিঃ ৪ ৩/৫সেঃ |
| ১৯১৪ | এস্, কে, সাধুখাঁ | কোন সমিতির সভ্য নয় | ৭মিঃ ৩৯সেঃ |
| ১৯১৫ | ঐ | বাগবাজার | ৭মিঃ ২ ১/৫সেঃ |
| ১৯১৬ | এম্, এল্, মুখার্জী | আহিরীটোলা | ৬মিঃ ২৪ ৪/৫সেঃ |
| ১৯১৭ | ঐ | ঐ | ৬মিঃ ২৯সেঃ |
| ১৯১৮ | ঐ | ঐ | ৬মিঃ ৩ ১/৫সেঃ |
| ১৯১৯ | ঐ | ঐ | ৬মিঃ ৪৬ ২/৫সেঃ |
| ১৯২০ | ঐ | ঐ | ৬মিঃ ২১ ৪/৫সেঃ |
| ১৯২১ | ডি, মুল্‌জী | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ৬মিঃ ১৯সেঃ |
| ১৯২২ | এম্, এম্, দে | ঐ | ৬মিঃ ১৭ ৪/৫সেঃ |
| ১৯২৩ | পি, কে, ঘোষ | সেণ্ট্রাল | ৫মিঃ ৪৯ ৪/৫সেঃ |
| ১৯২৪ | ডি, মুল্‌জী | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ৫মিঃ ৫৬ ১/৫সেঃ |
| ১৯২৫ | ঐ | ঐ | ৫মিঃ ৫৭সেঃ |
| ১৯২৬ | ঐ | ঐ | ৫মিঃ ৫৩সেঃ |
| ১৯২৭ | ঐ | ঐ | ৫মিঃ ৫৭ ৪/৫সেঃ |

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯২৮ | এন্, সি, মালিক | শ্মশানেশ্বর | ৬মিঃ ১০সেঃ |
| ১৯২৯ | ঐ | ঐ | ৫মিঃ ৫৫সেঃ |
| ১৯৩০ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩১ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩২ | পি, বি, ক্যারার | শ্মশানেশ্বর | ৬মিঃ ২২সেঃ |
| ১৯৩৩ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩৪ | দুর্গাদাস | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ৫মিঃ ৩৮সেঃ |

সাধারণের জন্য কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের সন্তরণ প্রতিযোগিতায়—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯৩৪ | দুর্গাদাস | কলেজ স্কোয়ার সুঃ ক্লাঃ | ৫মিঃ ৩৪$\frac{৪}{৫}$সেঃ |

## ২২০ গজ সন্তরণ প্রতিযোগিতা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯১৩ | ইউ, এল্, মুখার্জ্জী | আহিরীটোলা | ৩মিঃ ২২সেঃ |
| ১৯১৪ | ” | ” | ৩মিঃ ২০সেঃ |
| ১৯১৫ | এন্, সি, দে | স্পোর্টিং ইউনীয়ন | ৩মিঃ ৬$\frac{১}{৪}$সেঃ |
| ১৯১৬ | এস, এল্, মুখার্জ্জী | আহিরীটোলা | ৩মিঃ ৬সেঃ |
| ১৯১৭ | এন্, সি, দে | সেণ্ট্রাল | ২মিঃ ৫৯সেঃ |
| ১৯১৮ | এস্, এল্, মুখার্জ্জী | আহিরীটোলা | ২মিঃ ৫৪সেঃ |
| ১৯১৯ | জে, কে, গোস্বামী | সেণ্ট্রাল | ২মিঃ ৫৫$\frac{২}{৫}$সেঃ |
| ১৯২০ | এস্, এস্, শীল | আহিরীটোলা | ২মিঃ ৫১$\frac{২}{৫}$সেঃ |
| ১৯২১ | ” | ” | ২মিঃ ৫৩সেঃ |
| ১৯২২ | ” | ” | ২মিঃ ৫১সেঃ |
| ১৯২৩ | পি, কে, ঘোষ | সেণ্ট্রাল | ২মিঃ ৩৯সেঃ |
| ১৯২৪ | ডি, ডি, মুলজী | কলেজ স্কোয়ার | ২মিঃ ৪০$\frac{২}{৫}$সেঃ |

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯২৫ | ডি, ডি, মুলজী | কলেজ স্কোয়ার | ২মিঃ ৪১সেঃ |
| ১৯২৬ | ,, | ,, | ২মিঃ ৩৮½সেঃ |
| ১৯২৭ | ,, | ,, | ২মিঃ ৪৪সেঃ |
| ১৯২৮ | এ, বি, ব্যানার্জী | বাগবাজার | ২মিঃ ৪৭½সেঃ |
| ১৯২৯ | এন্, সি, মালিক | শ্মশানেশ্বর | ২মিঃ ৪৮⅖সেঃ |
| ১৯৩০ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩১ | ,, | | |
| ১৯৩২ | এস্, পি, গোস্বামী | সেণ্ট্রাল | ২মিঃ ৫৪সেঃ |
| ১৯৩৩ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩৪ | ডি, সি, দাস | কলেজ স্কোয়ার | ২মিঃ ৩৭⅖সেঃ |

## ১১০ গজ সন্তরণ প্রতিযোগিতা

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯১৩ | এফ, আর, ভ্যান্ ডাইক্ | ক্যাল্কাটা | ১মিঃ ২২সেঃ |
| ১৯১৪ | এইচ্, জের্ফড | ,, | ১মিঃ ২৪সেঃ |
| ১৯১৫ | এইচ্, এন্, হাম্ফ্রেজ | ,, | ১মিঃ ২১সেঃ |
| ১৯১৬ | টি, জি, মরো | ,, | ১মিঃ ২০সেঃ |
| ১৯১৭ | পি, সি, ভড় | আহিরীটোলা | ১মিঃ ২১½সেঃ |
| ১৯১৮ | ,, | ,, | ১মিঃ ১৪সেঃ |
| ১৯১৯ | ,, | ,, | ১মিঃ ১৩½সেঃ |
| ১৯২০ | ,, | ,, | ১মিঃ ১৬⅗সেঃ |
| ১৯২১ | এস্, এস্, শীল | ,, | ১মিঃ ১৫সেঃ |
| ১৯২২ | ,, | ,, | ১মিঃ ১৫⅘সেঃ |
| ১৯২৩ | | | ১মিঃ ১৫⅖সেঃ |

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯২৪ | পি, কে, ঘোষ | সেণ্ট্রাল | ১মিঃ ১০ ২/৫সেঃ |
| ১৯২৫ | ” | ” | ১মিঃ ৯ ১/৫সেঃ |
| ১৯২৬ | ” | ” | ১মিঃ ১১ ৩/৫সেঃ |
| ১৯২৭ | ডি, ডি, মুল্‌জী | কলেজ স্কোয়ার | ১মিঃ ১১সেঃ |
| ১৯২৮ | এইচ্‌, ডান্‌ফোর্ড | তালতলা | ১মিঃ ১৪সেঃ |
| ১৯২৯ | ” | ” | ১মিঃ ১৪সেঃ |
| ১৯৩০ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩১ | ” | | |
| ১৯৩২ | জি, দাস | কলেজ স্কোয়ার | ১মিঃ ১৪সেঃ |
| ১৯৩৩ | খেলা হয় নাই | | |
| ১৯৩৪ | কিঙ্কা | কলেজ স্কোয়ার | ১মিঃ ১৪ ২/৫সেঃ |

## বেঙ্গল অলিম্পিক

### ১০০ মিটার

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | যে সমিতির সভ্য | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯৩৪ | রাজারাম সাহু | সেণ্ট্রাল | ১মিঃ ৮সেঃ |

১০০ মিটার বা ১০৯ গজ ৩ ইঞ্চি

## আন্তর্জাতিক সন্তরণ প্রতিযোগিতা

### “লস্‌ এঞ্জেল”

| সন | পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি | প্রদেশ | সময় তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১৯৩২ | ওয়াই, মেজাকী | জাপান | ৫৮সেঃ |
| | **৪০০ মিটার** | | |
| ১৯৩৩ | সি, ক্রাব | ইউ-এস্‌-এ | ৪মিঃ ৪৮ ৪/১০সেঃ |
| | **১৫০০ মিটার** | | |
| ১৯৩২ | কে, কাটিমুরা | জাপান | ১৯মিঃ ১২ ৪/১০সেঃ |

# সাঁতার

( কথাশিল্পী শ্রীমনোজ বসু )

বাংলাদেশে নদী খাল-বিলের অন্ত নাই। সুতরাং এ দেশের লোকের স্বভাবতঃই সন্তরণপটু হইবার কথা। বস্তুতঃ নিম্ন বঙ্গের এমন জায়গার সহিত আমাদের পরিচয় আছে যেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা দেখিলে মানুষ যে জলচর প্রাণীবিশেষ, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

অতএব এই বাংলার মাটি ও জলে শ্রেষ্ঠ সন্তরণবীরদের জন্ম হইবে এমন আশা স্বচ্ছন্দে করা যাইতে পারে। বাস্তবিক আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোক আলো-হাওয়ার মতোই সন্তরণ-বিদ্যা অতি সহজে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ছোট ছেলেমেয়েরা ডাঙায় যেমন দৌড়-ঝাঁপ করে জলেও তেমনি অবাধে সাঁতার কাটে। এটা যে একটা কষ্ট করিয়া শিখিবার কিছু এ ধারণাই কাহারো মনে উঠে না। নদী ও খাল-বিলের সঙ্গে বসতি করিয়া এটা জানা না থাকিলে এ দেশের লোককে অর্দ্ধেক পঙ্গু হইয়া জীবন কাটাইতে হয় এবং দিনের মধ্যে দণ্ডে দণ্ডে অকাল-মৃত্যুর সম্ভাবনা ঘটিতে পারে।

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীখ্যাত সন্তরণ-বীরদের রীতি-নীতির সহিত এই অতি সাধারণ সাঁতার কাটার কোন তুলনাই হইতে পারে না। আমরা সাঁতার কাটি প্রয়োজনের তাগিদে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য,—সংসারে

দিন গুজরান করিতে যেটুকু নহিলে নয় কেবল সেইটুকু মাত্র। কিন্তু নিছক কলা-বিদ্যা হিসাবে ইহার চর্চ্চা করিয়া একপ্রকার উচ্চতর আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়—তাহাতে রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষালাভের প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না। তাই ইউরোপে যখন সাঁতার দিয়া ইংলিশ চ্যানেল পার হইবার বিপুল প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, ম্যাথিউজ ওয়েব নূতন রেকর্ড করিতে গিয়া অতলে ডুবিয়া মরিলেন ( ২৪শে জুলাই, ১৮৮৩ ), তখন এদেশে কোন সাড়া নাই। এমন কি বছর ছয়েক আগেও তের বছরের দুটি মেয়ে বার্ণিস ও ফিলিস ৫২ ঘণ্টা ২০ মিনিট অবিশ্রান্ত সাঁতার দিয়া যখন সমস্ত পৃথিবীর তাক লাগাইয়া দিল তখনও আমাদের দেশে ঐ ধরণের কোন উল্লেখযোগ্য সন্তরণবীর পাই নাই। তারপর এই দুটি মেয়েকে পরাস্ত করিবার কি দারুণ চেষ্টা সুরু হইল! জলের উপর অবিশ্রান্ত কত দীর্ঘকাল সাঁতার কাটা যাইতে পারে সেই শক্তির পরীক্ষা চলিল। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে মিসেস্ লতিমুর স্কোমেল একাদিক্রমে ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট ৪ সেকেণ্ড সাঁতার দিয়া সমস্ত পুরাতন সময়-নির্দ্দেশ (record) ভাঙিয়া ফেলিলেন। অতঃপর মিসেস্ ক্যাথারাইন নেহুয়া সাঁতার দিয়াছিলেন ৭২ ঘণ্টা ২১ মিনিট। এর চেয়ে বেশী অন্য কেহ সাঁতার দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দীর্ঘ সময়ব্যাপী (endurance) সন্তরণ আমাদের দেশেও রীতিমত আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে প্রফুল্ল ঘোষ গত ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, প্রধানতঃ তাহাই ইহার কারণ। অগ্নিকুমার সেনই বোধ হয় এদেশে সর্ব্বপ্রথম দীর্ঘ সময়ব্যাপী সন্তরণের উদ্যম করেন। ১৯২৭ সাল—তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উপর—কলেজ স্কোয়ারে

একাদিক্রমে তিনি ১৪ ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছিলেন। তাহার পর ১৬ বছর বয়সের বালক মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী হেদুয়ায় ১৬ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া অগ্নিকুমারকে পরাভূত করেন। হায়দ্রাবাদের সফি আমেদ ইহার পরে সাঁতার দেন ২৬ ঘণ্টা।

১৯২৯ সালে প্রফুল্ল ঘোষ সর্ব্বপ্রথম কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে দীর্ঘকাল-ব্যাপী সন্তরণে নামিয়াছিলেন। সেবার তিনি জলে থাকিতে পারিয়াছিলেন মাত্র ২৮ ঘণ্টা। কিন্তু সাঁতারের বিশেষত্ব ছিল এই প্রফুল্লকুমার কেবলমাত্র ভাসিয়া ছিলেন না, অবিরত চলিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সেই সন্তরণ-চক্রের হিসাব করিলে দূরত্ব ২৫ মাইলের বেশী হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী ও বীরেন্দ্র পাল ঐ বৎসরেই প্রফুল্ল ঘোষের রেকর্ড ভাঙিয়া যথাক্রমে ২৯ ও ৩২ ঘণ্টা সন্তরণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ বৎসর কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে একাদিক্রমে ৫৪½ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া কলিকাতায় অপূর্ব্ব সাড়া জাগাইয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জলের উপর কেবলমাত্র ভাসিয়া ছিলেন, পরিভ্রমণ করিয়া ঐ দিকের কোন নূতন রেকর্ড করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাসের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩০ সালে প্রফুল্ল ঘোষ যে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সে কথা দেশবাসী কোনদিন ভুলিতে পারিবে না। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে বাঙালী পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় হইবে এই বিরাট সঙ্কল্প লইয়া বিমুগ্ধ লোকচক্ষুর সম্মুখে তিনি কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে নামিয়াছিলেন। তখন আর্থার রিজো পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণবীর বলিয়া সমাদৃত। তিনি মেডিটেরেনিয়ানে ৬২ ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছিলেন। লতিমুর স্কোমেলের ৭২ ঘণ্টা সাঁতারের সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহের কারণ আছে। প্রফুল্লকুমার ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট সাঁতার দিয়া আর্থারের রিজোকে পরাভূত করেন। জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সন্তরণবীরের আসনে বাঙালী অধিষ্ঠিত হইল, কিন্তু একমাস পরেই আর্থার রিজো পুনরায় ৬৯ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া প্রফুল্লকুমারের রেকর্ড নষ্ট করিয়া দেন। পর বৎসর ১৯৩১ সালেও আর একবার দৃঢ়-সঙ্কল্প লইয়া প্রফুল্লকুমার জলে নামিয়াছিলেন, কিন্তু সেবারের সন্তরণ কাল আরও ৩৫ মিনিট কম হইয়া গেল।

তা হউক। তবু সাঁতারে বাঙালীর বিজয়-গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্লকুমার ও অন্যান্য সন্তরণবীর এই দিক দিয়া জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমরা কোনদিন ভুলিব না। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বল দীপমালার নীচে অন্ধকারে বসিয়া যে আপন-ভোলা লোকটি নিঃশব্দে আলোর শিখা বাড়াইয়া দিতেছেন বাঙালী জনসাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

ইনি শান্তিপ্রিয় পাল। প্রফুল্ল ঘোষ-প্রমুখ সন্তরণবীরদের শিক্ষা দিয়া ইনিই গড়িয়া তুলিয়াছেন—বাংলাদেশে সন্তরণের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে সসম্ভ্রমে ইঁহার নিষ্ঠা ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের উল্লেখ করিতে হয়। দেশকে সমৃদ্ধ ও গৌরবময় করিবার নানাবিধ পন্থা আছে। শান্তিবাবু নিজের ব্যক্তিগত নাম-যশের কামনা না করিয়া বছরের পর বছর অনাড়ম্বরভাবে এই পথে যে কাজ করিয়া আসিতেছেন তাহার মূল্য অপরিমেয়।

কেবল সাঁতার-শিক্ষক নহেন, নিজেও তিনি সাঁতারে মহা ওস্তাদ। ওয়াটার-পোলো খেলাতে শান্তিবাবুর জুড়ি পাওয়া ভার। বক্সিংএও তাঁহার কৃতিত্ব আছে। কিন্তু সব চেয়ে তাঁহার বড় গৌরব এই যে দেশ-ব্যাপী কলুষতা ও বিলাসের আবহাওয়ার মধ্যে তিনি শক্তির উদ্বোধন করিতেছেন। সকল প্রকার আমোদ ও আরামের জীবন পরিহার করিয়া তিনি শক্তির সাধনায় দিনপাত করেন। সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব প্রধানতঃ

শান্তিবাবুর যত্নে স্থাপিত—এই ক্লাব প্রফুল্ল ঘোষকে গড়িয়া তুলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। পাল্স্ বক্সিং ইনষ্টিটিউসন—বক্সিং শিখবার আখড়া—ইহাও শান্তিবাবুর কীর্ত্তি। কলিকাতা স্কুল অফ্ ফিজিক্যাল্ কাল্চারের শান্তিবাবু একজন বিশিষ্ট অবৈতনিক শিক্ষক।

১৯২৭ সালে প্রফুল্ল ঘোষ যখন শান্তিবাবুর কাছে আসেন তখন তিনি সন্তরণে একেবারে আনাড়ী। সমস্ত শক্তি দিয়া শান্তিবাবু তাঁহাকে শিখাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ একের পর এক এইরূপ বিজয়ী শিষ্য গঠন করিয়া শান্তিবাবু নিজে ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে পাশে দাঁড়াইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক রীতিতে সাঁতার শিক্ষা দিতে তাঁহার জুড়ি বোধ হয় বাংলায় আর নাই। শিষ্যভাগ্যে শান্তিবাবু প্রচুর গর্ব্ব বোধ করিয়া থাকেন। প্রফুল্ল ঘোষ ছাড়াও জে. কে. গোস্বামী, এস্. গোস্বামী, এস্. দত্ত, কে. পি. রক্ষিত, জি. দাস, এন্. ঘোষ, সুকুমার ভড় প্রভৃতি অনেকেই শান্তিবাবুর শিষ্য।...

বিচিত্রা—ফাল্গুন, ১৩৩৯

## দীপালী

যে বাংলাদেশ একদিন বীরপ্রসূ ছিল, যে বাঙালীর লাঠি এক সময় ভারতে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছিল, যে দেশে দৈহিক বল একদিন গৌরবের বস্তু ছিল, সেই বাংলায় সেই বাঙালী এখন দেহে-মনে অতি দুর্ব্বল, ডিস্পেপ্সিয়ায় নিরবচ্ছিন্ন রুগ্ন, ঠেলা মারিলে পড়িয়া যায়, চাম্ড়া-ঢাকা একখানি নর-কঙ্কাল। দৈহিক শক্তির কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে—সে শক্তির অনুশীলনও তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে।

এখন দেহের শক্তির চর্চ্চা না করিয়া, তাহারা দেহের পরিচর্য্যাতেই ব্যস্ত। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, পৃথিবীতে যত রোগ আছে সবগুলিই ক্রমশঃ এই সুজলা সুফলা বাংলাদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। ইহার জন্য কে দায়ী—তাহা অন্য প্রসঙ্গ। তবে শারীরিক শক্তি-চর্চ্চা বা ব্যায়াম অনুশীলন দেশ হইতে প্রায় উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

অথচ এত বড় একটা বিরাট জাতি দিনে দিনে পলে পলে মৃত্যুর মুখে আগাইয়া চলিয়াছে। এ-যুগের শতকরা ৯৯ জন যুবকের দেহে ও মনে বিলাস এমন বাসা বাঁধিয়াছে যে, তাহারা মরিবে সে-ও শ্রেয় তবু বিলাস ছাড়িবে না। কাজেই এই দুর্দ্দিনে যে তরুণের দল নির্ব্বিলাসী হইয়া নীরবে শক্তির সাধনা করিতেছেন—তাঁহাদিগের কথা মনে করিতে সত্য সত্যই বুকখানা দশ হাত হইয়া উঠে। ক্ষীণ আশা হয়, হয়ত ইহাদের সদৃষ্টান্তে একজন তরুণও সৎ প্রেরণা লাভ করিতে পারে।

এই কর্ম্মীদলের অগ্রণী শ্রীমান্ শান্তি পাল। ইহার প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে হেদুয়ার সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। শান্তিবাবু নিজে একজন ভাল সাঁতারু, শুধু তাহাই নহে—একজন ভাল সাঁতার শিক্ষকও। শান্তিবাবুরই ছাত্র সুবিখ্যাত সন্তরণ-বীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ, জে. কে. গোস্বামী, এস্. দত্ত, কে. পি. রক্ষিত, ডি. দে প্রভৃতি। শান্তিবাবুর শিষ্য-গৌরব বহু গুরুরই বাঞ্ছিত।

শান্তিবাবু মুষ্টি খেলাতেও বিশেষ পারদর্শী। পাল্‌স বক্সিং ইনষ্টিটিউশন্ শান্তিবাবুর প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা স্কুল অফ্ ফিজিক্যাল্ কালচারে শান্তিবাবু একজন অবৈতনিক শিক্ষক।

—কার্ত্তিক, ১৩৩৯